অন্নপূর্ণার মন্দির

(উপন্যাস)

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

মূল্য বারো আনা

বক্তব্য

এই উপন্যাসখানি পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; সম্প্রতি আমাদের সোদরোপম শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ যত্ন, তত্ত্বাবধান এবং চেষ্টায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। তাঁহার সাহায্য-ব্যতীত এ পুস্তক কখনই প্রকাশিত হইতে পারিত না। এজন্য প্রচলিত প্রথামত পুস্তকের প্রারম্ভেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কিন্তু তিনি আমার সোদরতুল্য, অতএব মিথ্যা বাগাড়ম্বরের চেষ্টা না করিয়া কেবল এ পুস্তকের সঙ্গে তাঁহার নামটি গ্রথিত করিয়া রাখিতে চাই। আজি-কালিকার সাহিত্য-সমাজে সুলেখক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে বক্তব্য—কোনকালে নিজের লেখা গল্প বা অন্য-কিছু যে ছাপাইতে হইবে কিম্বা তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাঁহাদের উৎসাহ, যত্ন ও স্নেহে, চেষ্টা করিলে যে আমি অন্ততঃ-কিছু লিখিতে বা বলিতে পারি, এই বিশ্বাস আমার মনে জন্মিয়াছিল, এবং যাঁহাদের শিক্ষকতা ও সহযোগিত্বই হাতে খড়ি দেওয়াইয়া আমায় সাহিত্য-চর্চ্চার পথে টানিয়া আনিয়াছে, আমার সেই অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট এবং আমার ভ্রাতৃতুল্য তাঁহার সুহৃদ্বর্গকে অদ্য স্মরণ ও প্রণাম করা উচিত বলিয়া আমি মনে করিতেছি।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। লেখিকা

১লা শ্রাবণ, ১৩২০।

এই দুঃখ-শোক-অভাবময় এবং

নানা অত্যাচার-পীড়িত সংসারে

যাঁহারা

পরের বেদনায় অশ্রু ত্যাগ করিয়া থাকেন,

ব্যথিতের সহিত মিষ্ট মুখে কথা কহেন,

এক দিনের জন্যও দুঃখীর দুঃখের ভাগ লন,

নিরাশ্রয় অনাথকে আশ্রয় দেন এবং

তাহাদের দুঃখ-মোচনে আন্তরিক সচেষ্ট থাকেন;

এই স্বার্থান্ধকারময় জগতের বক্ষে

যাঁহারা পুণ্য-শুকতারা;

জানিত এবং অজানিত সেই সকল

মহানুভব ও মহীয়সীগণের

পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

তাঁহাদেরই উদ্দেশে নিবেদিত হইল।
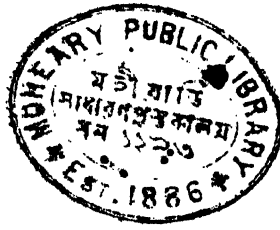
অন্নপূর্ণার মন্দির

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রামের প্রান্তভাগ দিয়া নির্ম্মলসলিলা নদীটি বহিয়া চলিয়াছে, —গ্রীষ্মতাপে ক্ষীণকায়া কিন্তু ক্ষিপ্রগতিশালিনী। তীরে বাবুদের ফল-বাগানে নারিকেল তাল প্রভৃতি গাছগুলা উচ্চ শির তুলিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, প্রদোষের মৃদু বায়ুস্পর্শে কচিৎ এক আধবার বা মাথা নাড়িতেছে। বৃক্ষান্তরালে শিব-মন্দিরের শ্বেত গাত্র সম্পূর্ণ লুক্কায়িত, কেবল পিতল-নির্ম্মিত ত্রিশূলটি পশ্চিমাকাশ-স্থিত সূর্য্যের ঈষদারক্ত কিরণে উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে।

এখনও লোক-সমাগম হয় নাই, কেবল বাবুদের বহুব্যয়ে নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত চিক্কণ সোপান বাহিয়া একটি বালিকা ঘাটে নামিতেছিল। তাহার কক্ষে পিতলের কলসী, স্কন্ধে একখানা বস্ত্র ও গামছা। বালিকা সোপানের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে!

তাহাকে না দেখিয়া শুষ্ক বস্ত্রখানা সোপানে রাখিয়া বালিকা জলে নামিল। গা ডুবাইয়া অন্যমনে জল লইয়া কুলি করিতে লাগিল। এমন সময় ধীরে ধীরে সোপানের উপর আর একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমা বালিকাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া ধীরে ধীরে সোপান বাহিয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া একটু শব্দ করিতেই প্রথমা সচকিতে ফিরিয়া চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "উঃ, ভয় লেগেছিল।"

দ্বিতীয়া ঈষৎ কৌতুকের স্বরে বলিল, "ইঃ, কচি খুকী! এমন অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছিস্ যে টেরও পেলি নে! কতক্ষণ এসেছিস্?

"এই কতকক্ষণ। তোমার আজ এত দেরী কেন? অন্য দিন তুমিই আগে এস।"

"বলব এখন। তুই অমন এক মনে কি ভাবছিলি, আগে বল্।"

প্রথমা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "ভাবব আবার কি?"

"কি, বই কি?" এই বলিয়া সখীর গায়ে দ্বিতীয়া জল ছিটাইয়া দিল। তথাপি প্রথমা নীরবে কাপড় কাচিতে লাগিল। দ্বিতীয়া তখন তাহার কাপড়খানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল্ না—বলতেই হবে।"

প্রথমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিল, "আঃ, কি কর ভাই, ছাড়।" দ্বিতীয়া কাপড় ছাড়িয়া দিয়া অভিমানে মুখ ফিরাইল।

প্রথমা তখন অনুতপ্তা হইয়া বলিল, "তোমার বড় রাগ করা অভ্যাস ভাই। যাক্, আমারি দোষ হয়েছে—কি বলব, বল?"

"কি ভাব করেছিলি কেন?"

"নতুন কথা কিছুই নয়। আমাদের সংসারের কথা কি তুমি জান না—তাই কেবল লজ্জা দাও!"

দ্বিতীয়া একটু তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "ওঃ, সেই দুঃখ! আমি ভাবলুম বুঝি—"

"তোমার মুখে এ কথা খাটে বই কি!"

প্রথমা এই কথা বলিতে না বলিতে দ্বিতীয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমার মত ভাবনায় যদি তুই আজ পড়তিস্ ত না জানি কি করতিস্! ত্থাখ্, তবুও ত আমি তোর মত শুকনো মুখে নেই।"

প্রথমা দ্বিতীয়ার পানে স্থির আয়ত চক্ষে চাহিল। প্রকৃতির শোভা চতুর্গুণ বাড়াইয়া সুনিপুণ চিত্রকর যেন একখানি সজ্জিতা প্রতিমা নদীবক্ষে স্থিরভাবে দাঁড় করাইয়া দিল। মৃদু বায়ুতে কবরীভ্রষ্ট দুই একগাছি কেশ মৃদু দুলিতেছিল, নদী সুনীল বক্ষ দর্পণে সে মূর্ত্তি তুলিয়া লইল! হীনতেজ রবির রক্তিম কিরণ সে চিত্রের সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিল! প্রকৃতি মমতাময়ী, ভাগ্য-দেবতা অকরুণ!

বালিকা মৃদু কণ্ঠে বলিল, "তোমার কিসের দুঃখ, কমলা? তুমি বড় লোকের আদরের মেয়ে, চারিদিকে সুখ-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য, ভাই বোন মা সকলের হাসিমুখ; তাঁদের কোন কষ্ট-যাতনা তোমায় দেখতে হয় না, শুনতে হয় না,—তোমার কি দুঃখ? কি কষ্ট?"

"তা কি থাকৃতে পারে না? গরীব হওয়াই বুঝি সব চেয়ে দুঃখ!"

বালিকা একটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "তা জানি না।"

তাহারা যে গরীব, তাহা লোকের কাছে বলিয়া বেড়ান বালিকার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সে চুপ করিয়া রহিল। কমলা বলিল,

"সত্যি, ভেবে ত্থাখ্ ও সব কষ্ট ত অতি সহজেই মিটে যেতে পারে, —কিন্তু যারা মনের কষ্ট পায়, তাঁদের কষ্ট কিসে শেষ হয়, বল্ দেখি ?"

সতী অনিচ্ছাতেও একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার তা হলে সেই রকম কিছু কষ্ট হয়েছে, বুঝি ?"

"আমি বড় লোকের মেয়ে, আমার আবার কষ্ট কি—দুঃখ কি, সতী ?"

"মাপ কর ভাই, আমার দোষ হয়েছে। কি হয়েছে, বল না ?"

"জানিস্, আমার বিয়ে !"

"বিয়ে ? কবে ?"

"বোধ হয়, মাসখানেকের মধ্যেই। জিজ্ঞাসা করবি না, কার সঙ্গে ?"

সতী একটু হাসিয়া বলিল, "সে জানা আছে। বিশু দাদার সঙ্গে।"

"না রে—তা হলে আর মজা কি—আর একটা কে—আজ সম্বন্ধ এনেছে।"

সতী বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া বলিল, "তবে তুমি যে বল, বিশুদাদা ভিন্ন কাউকে বিয়ে করবে না, তোমার বাপ মা বুঝি ওখানে বিয়ে দেবেন না ?"

"ওখানে ত কোন দিন কথা হয়নি ;—তাঁদের আর এতে দোষ কি ?"

"তবে বুঝি তুমি নিজেই ও রকম কথা বলতে ? কেউ শুনলে কি লজ্জা !"

"ওঃ, লজ্জায় ত মরে গেলুম। আমার যদি ইচ্ছে হয় ত কেন বল্‌ব না ?"

"তার পর, এখন ? বাপ-মাকে বুঝি ঐ কথা বলবে ?"

"তাই ভাবছি। কিন্তু তার আগে যাঁর মন জানার দরকার, তাঁর মন জানার কি হয় ?"

দুঃসাহসিকা কমলার পানে চাহিয়া সতী বিস্মিতভাবে বলিল, "কার মন জানবার দরকার—বিশুদাদার ? ছি, ছি, কি লজ্জার কথা ! তোমার ভাই খুব সাহস ত !"

কমলা বিস্ময় ও বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "তা ভিন্ন এতে আর উপায় কি আছে ? তুই বুঝি কোন বই কিচ্ছু পড়িস্‌ না ?"

সতী একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "রামায়ণ মহাভারত পড়ি।"

কমলা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "তবেই ত সব পড়। আজ আমাদের বাড়ী বেড়াতে আস্‌বি ? ভাল বই পড়তে চাস্‌ ত' দিতে পারি।"

সতী সহসা একটু থমকিয়া গেল। তাহার মনে তখনি কমলা ও তাহার অবস্থাভেদের কথা উদয় হইল—একটু জোরের সহিত সে বলিল, "না, সে সব বইয়ে আমার দরকার নেই।"

"তা না থাক্‌, আজ আস্‌বি ত ?"

"বলতে পারি না। জ্যেঠাইমা যদি না বকেন ত যাব।"

"আচ্ছা, তোর মা অত ভালমানুষ, আর জ্যেঠাইমা অমন কেন ?"

"জানি না। এখন উঠি, চল, রাস্তায় লোক হবে।"

উভয়ে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কলসী লইয়া উঠিতে সতীর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া কমলা বলিল, "অত বড় একটা কলসী না আন্‌লেই নয় ?"

"না আন্‌লে চলবে কেন ?"

"কেন চলবে না ? তোর মা-রা নিয়ে যান্ না, কেন ?"

"তাঁরা যদি নিতে পারেন ত আমিও কেন পার্‌ব না ?"

"তোর বোন্ সাবিত্রী, সে নিয়ে গেলেও ত পারে।"

"আহা, সে যে ছেলেমানুষ !"

কমলা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "ভারী ত ছেলেমানুষ ! তোর চেয়ে মোটে ত দু বছরের ছোট।"

"ও রকম কথা বলো না ভাই ! সে আমার চেয়ে ঢের বেশী সহ্য করে। তোমাদের বড় লোকের ঘরে ও রকম মেয়ে সহজে দেখ্‌তে পাবে না, তা জেনো। ছোট ভাইটির যত আব্দার, সে সহ্য করে। দাদার দৌরাত্ম্য, জ্যেঠাইমার বকুনি, বাবার ফরমাস্ সে যত মেনে চলে, তার একাংশও আমি পারি না। গরীবের ঘর বলে তার অত গুণও তোমাদের চোখে পড়ে না।"

কমলা একটু অপ্রতিভ হইয়া নীরবে রহিল। সতীর সঙ্গে তাহার এই এক অদ্ভুত রকমের ভালবাসা। সে অবশ্য সতীকে ব্যথা দিবার জন্যই ব্যথা দেয় না, অভ্যাসবশত ঐরূপ অহঙ্কারসূচক বাক্য তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া যায়। সতীও তাহা নীরবে সহ্য করে না, বিলক্ষণ দুই কথা শুনাইয়া দেয়। সতী অত্যন্ত অভিমানিনী এবং কেহ কিছু অন্যায় বলিলে সহিতেও প্রস্তুত নয়।

কিন্তু তথাপি কেহ কাহারও উপর বেশীক্ষণ রাগ করিয়া থাকিতে পারে না। কমলা অপ্রস্তুত হইল,—রাগ করিল, কিন্তু বেশীক্ষণ নীরব থাকিতে পারিল না। বলিল, "বেশ ভাই ! আমি যেন তাই বল্‌লুম, তুইও কি কথা শোনাতে কম করিস্ ?"

সতী তখন একটু হাসিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "তুমিও শোনাও না কেন ?"

"আমি ভাই তা আর পারি কই ! এখন আমাদের বাড়ী কবে যাবি, বল্ ?"

"যাব, যেদিন হয়, এক দিন।"

"তা হবে না, তোর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে, তুই নইলে হবে না—আসিস্ একটু শীগগির ক'রে—বুঝ্লি ?"

"আচ্ছা" !

কমলা তারাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার-ঘরের মেয়ে, বড়বাবুর আদরের দুহিতা, সর্ব্বসুখভোগে লালিতা-পালিতা। তথাপি রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের কন্যা সতীর সঙ্গে তাহার যে কেন সখ্য ছিল, তাহা বলা কিছু কঠিন। দরিদ্রের সঙ্গে ধনপতির সৌহার্দ্যবন্ধন একটু বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। কমলা যে এজন্য বাটীতে কিছু খোঁটা না সহ্য করিত, এমন নহে, এবং দরিদ্রের যেমন একটা গূঢ় অভিমান ধনীদের বিরুদ্ধে দেখা যায়, তাহারি বশে সতীর অভিভাবিকারাও এজন্য তাহাকে অনুযোগ করিত। উভয় পক্ষ হইতেই এ ঘটনাটা সকলের আলোচ্য বিষয়েরই অন্তর্ভূত। তথাপি কেহ কাহারও সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিত না। এ ব্যাপার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে, রমণীতে রমণীতে সৌন্দর্য্য, সমবয়স এবং বালোচিত সঙ্গলিপ্সার যে আকর্ষণ, তাহাতেই এ কাণ্ড ঘটিয়াছিল। কমলা ত্রয়োদশ—সতী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র। তাই তাহাদের এমন অমল ভালবাসা এখনো টিঁকিয়া আছে।

কমলা বাটী গিয়া একখানা খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

বিবাহের সংবাদে সত্য সত্যই সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। কেন না, আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে সে তাহার বিবাহের বিষয় ভাবিয়া রাখিয়াছিল। যেদিন সে ঘাটে সাঁতার দিতে গিয়া কিছুদূর ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিন বিশ্বেশ্বরই তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করে। এ কথা আর কেহ জানে না, কেবল সতী জানে। কমলা সেই ঘটনার পর হইতে এই তিন বৎসরে যত পুস্তক পড়িয়াছে, তাহাতে এরূপ স্থলে একই কথা লেখে। বিশ্বেশ্বর দেখিতে মন্দ নয়, নব্য যুবক, স্বশ্রেণী, বিবাহও হয় নাই। সেও সুন্দরী, ধনীর কন্যা এবং অবিবাহিতা। এরূপ স্থলে ভালবাসা এবং তৎপরিণামে বিবাহ ত অবশ্যম্ভাবী। ভালবাসাটার সন্ধান যদিচ এ পর্য্যন্ত মুখামুখি রকমে হয় নাই, কেন না, বিশ্বেশ্বরের বাড়ী অন্য পাড়ায়, সে বাড়ীতে তাহার গমনাগমনও নাই, ও সেই ঘটনার পর ধরিতে গেলে বিশ্বেশ্বরের সহিত তাহার একরকম দেখা-সাক্ষাৎই হয় নাই। কিন্তু উপরিউক্ত অনিবার্য্য নীতি-অনুসারে সে তাহাকে ভালবাসিতে বাধ্য, বাসেও, অতএব বিশ্বেশ্বরই বা কেন না বাসিবে! যদিও তাহার এই বিবাহের সম্বন্ধেও বিশ্বেশ্বরের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু অমন অনেক পুস্তকেই হয়! শেষ পাতে কিন্তু মিলন ঘটেই। যেখানায় তাহা না ঘটে, সে বইয়ের গ্রন্থকারকে কমলা অভিশম্পাত দিয়া থাকে, এবং জীবন-নাটকের সেরূপ শেষাঙ্কও সে দেখিতে ইচ্ছা করে না।

কমলা অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়া ভাবিল। একজন খাবার খাইবার জন্য ডাকিতে আসিলে তাহাকে তাড়া দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দ্বারে সে খিল দিল। একখানা নূতন পুস্তক আসিয়াছিল, সেইখানা খুলিয়া তাড়াতাড়ি শেষ পৃষ্ঠা উল্টাইল, দেখিল, নায়ক

নায়িকা সেখানে অতি আরামে ঘরকন্না করিতেছেন। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কমলা তখন খাটে শুইয়া বইখানা পড়িতে আরম্ভ করিল। পড়িতে পড়িতে কখন যে মন লাগিয়া গেল এবং পড়িতে পড়িতে আর সব কথা ভুলিয়া গিয়া নায়ক-নায়িকার দুঃখে কাঁদিয়া-কাটিয়া কখন যে বই বুকে করিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল, ঝি এবং মাতার দ্বার-ঠেলাঠেলিতে জাগিয়া উঠিয়া সে সব কথা সে স্মরণেও আনিতে পারিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে! জীর্ণ ক্ষুদ্র বাটীখানির দাওয়াতে বসিয়া অকালবৃদ্ধ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য তামাকু টানিতেছিলেন। নিকটে কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো একটা পিঞ্জরের মধ্যে সদ্য জাগরিত টিয়া পাখীটি কয়েকবার "দুর্গা, দুর্গা, তারা ব্রহ্মময়ী, হরেকৃষ্ণ" প্রভৃতি নাম পড়িয়া আপাততঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাসি ও তামাকু টানা শব্দের প্রতিধ্বনি করিতেছিল। জীর্ণ, খড়ে-ছাওয়া রান্নাঘরের পৈঁঠার একধারে কুকুরটা শুইয়া আরামে নাক ডাকাইতেছিল, প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা আম্রবৃক্ষের নিম্নে খোঁটায় বাঁধা গাভীটি সস্নেহে বৎসের গাত্র লেহন করিতেছিল। চারিদিকই স্থির, শান্ত। বাতাস নিতান্ত নিরুদ্বেগ চিত্তে প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বস্থিত কলাগাছ কয়টির পাতাগুলি নাড়িতেছে, গাছের তাহাতে তেমন চাঞ্চল্যের ভাব নাই। ভট্টাচার্য্য বোধ হয় ভাবিতেছিলেন যে, সবাই এমন নিশ্চিন্ত,

এমন স্থির, কেবল মানুষই এত উদ্বিগ্ন-চিত্ত, এত চঞ্চল, কেন? পাখীটা আনন্দে পড়িতেছে, ব্যঙ্গ করিতেছে, গাভীটা সস্নেহে বৎসকে আদর করিতেছে, কুকুরটা নির্ভাবনায় ঘুমাইতেছে; তাহাদের ত চিন্তার লেশও নাই। তাহারাও ত খায়, কিন্তু সে জন্য ভাবিয়া মরিতে হয় না। তাহাদের জন্য যে মানুষেরা ভাবিতেছে তাহারা যেন ইহা স্থির-নিশ্চিত জানে। তবে মানুষের জন্য কেহ ভাবে না, কেন? মানুষকেই কেন খাটিয়া ভাবিয়া নানা কৌশল করিয়া উদর পুরাইতে, সংসার চালাইতে হয়? পৃথিবীটা এমন পক্ষপাতী কেন? যাহা লইয়া তাহার গৌরব, সেই মানুষের উপরই তাহার করুণা এত কম, কেন?

ভাবিতে ভাবিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে ধূমের একটা কুণ্ডলী সৃজন করিয়া ফেলিলেন। বহু-পুরাতন, কঙ্কালমাত্র-অবশিষ্ট ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের দ্বার খুলিয়া একটী রমণী বাহির হইয়া আসিল। পরিধানে একখানি সরু লাল পেড়ে বস্ত্র মাত্র, হস্তে দুইগাছি সাদা শঙ্খ, ললাটে সিন্দূরবিন্দু, এই সামান্য বেশেই দাওয়াখানি যেন আলো হইয়া উঠিল। রমণী কূয়া হইতে জল তুলিয়া দ্বারে-চৌকাঠে ছড়াইয়া দিল, পরিষ্কৃত তুলসীতলাটি হস্তদ্বারা নিকাইয়া ফেলিল। হাত ধুইয়া স্বামীর নিকট এক ঘটী জল ও একটা দাঁতন রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া সে মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মৃদু স্বরে বলিল, "এত সকালে উঠেছ? কাল রাত্রে বুকে অত বেদনা করেছিল, কেন ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ?"

হুঁকাটি দেওয়ালের গাত্রে ঠেস দিয়া রাখিয়া মুখ হইতে একটা ধূম-কুণ্ডলী বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "চুলোয়

যাক্, বুকের ব্যথা! মরণ হলেও ত বুঝ্‌তুম; নিশ্চিন্তি হতে পারতুম। না মলে ত আর নিস্তারও নেই।"

মর্ম্মাহতা সাধ্বী নীরব দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নীরবে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আম্রবৃক্ষের প্রতি চাহিলেন। স্ত্রী ধীরে ধীরে বলিল, "মুখ ধোও।"

"মুখ ধোব'খন, যখন হয়। ঘরে চাল-ডাল কিছু আছে ত?"

স্ত্রী নীরবে ঘাড় নাড়িল। স্বামী উদ্ধত স্বরে বলিলেন, "জমি বিক্রীর টাকাগুলো সবই ফুরিয়েছে?"

"অতি অল্পই ত দাম হয়েছিল, তিন মাস সেই টাকাতেই চল্‌ল—আর কতদিন চল্‌বে?"

"না চল্‌বে ত, আমিই বা আর কি কর্‌ব? চুরি কর্‌ব, না, ভিক্ষে কর্‌ব?"

স্ত্রী নীরবে চোখের জল মুছিল। স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা কেবল ঐ জান! কাঁদলে যদি উপায় হত ত আমিও না হয় কাঁদ্‌তুম।" তার পর ঈষৎ নম্র স্বরে বলিলেন, "আজ আর আমি ঘুরতে পাচ্চি না। কোন রকমে আজ চালিয়ে নাও, কাল তখন দেখা যাবে।"

ভট্টাচার্য্য উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়ায় গমন করিলেন। স্ত্রী ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একগাছা ঝাঁটা হস্তে লইয়া উঠান ঝাঁট দিতে দিতে দুই-একবার ডাকিলেন, "সতি, সতি!"

দ্বার খুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে একটী কুসুম-কলিকা-তুল্যা বালিকা দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল, মাতাকে মার্জ্জনা-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া আসিয়া বলিল, "কি, মা?"

"সতী এখনো ওঠেনি? উঠোন্‌টা ঝাঁট দিত! আমি ততক্ষণ জলটুকু তুলে নিতুম।"

"আমি জল তুল্‌ছি" বলিয়া বালিকা কূপের নিকট ছুটিল। মাতা নিবারণ করিলেন, "অত জল তুলতে পারবি না, কষ্ট হবে, রাখ্‌, আমি যাচ্চি।"

বালিকা সে কথা না মানিয়া জল তুলিতে আরম্ভ করিল। জাহ্নবী বেশী কথা বলিতে জানিতেন না, কন্যাকে আরও দুই একবার নিবারণ করিয়া নীরবে নিজ কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

সতীর বিধবা জ্যেঠাইমা "সুপ্রভাত, সুপ্রভাত" বলিতে বলিতে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাতৃকে গৃহ-কার্য্যে নিযুক্তা দেখিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মায়ে-ঝিয়ে ত কাজ-কর্ম্মের খুব ধুম লাগিয়েছ, এ'দিকে কাল চাল বাড়ন্ত বলেছি তা বুঝি হুঁস্ নেই? ঠাকুরপো গেল কোথায়? বাজার যাক্ না, এই বেলা। এখনি কালীপদ উঠে খেতে চাইবে—গয়লা মাগী কাল দুধটুকুও দেয়নি গা। আর দেবেই বা কি! যে তোমাদের গতিক, সাত জন্মে দামটি দেবার নাম করবে না! সে দুঃখী মানুষ, দেবে কোথা থেকে?"

একটু কাতর কণ্ঠে জাহ্নবী বলিলেন, "এখন ও সব কথা থাক্ না, দিদি। এই মাত্র কত দুঃখ করে গেলেন, শুনতে পেলে বেশী মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, আমাদের ত ও নিত্যকার কথা। আর গয়লার যা বলছ,—গয়লার বেশী ত পাওনা নেই, খালি এই মাসের পাওনাটা।"

জ্যেঠাইমা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "তাই বা কি কম হল?

তোমাদের ভাল কথা বলবার যো নেই। আমার আর কি এত গরজ! তবে ছেলেটার দুধ না পেলে কষ্ট হয়, তাই বলি! তা মরুক গে—"এইরূপ বকিতে বকিতে জ্যেঠাইমা গরুকে বিচালি দিতে গেলেন। আবার তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিল, "হতভাগা গরু, অলপ্পেয়ে গরু, বাছুর বড় হল, আর দুধ দেবে না, কেবল খাবে। অমন গরু ভাগাড়ে যায় না কেন!"

সাবিত্রী ম্লান মুখে একবার বলিল, "ভাল করে কুই খেতে পায় যে, দুধ দেবে?"

জ্যেঠাইমা সে কথা কানেও তুলিলেন না। নিদ্রিত কুকুরটাকে গিয়া এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিলেন। বেচারা কেঁউ কেঁউ করিতে করিতে পলাইল। ব্যাপার দেখিয়া পাখীটা চুপ্ হইয়া গিয়াছিল, জ্যেঠাইমা সম্মুখে আর কাহাকেও না দেখিয়া নীরব পক্ষীটার উদ্দেশে, "হতভাগা বাড়ীর হতভাগা পাখী, সকালে একটা দেবতার নাম মুখে নেই" ইত্যাদি কতকগুলা বকিয়া গেলেন।

গোলমালে সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরে আসিয়া সকলকে উঠিতে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইয়া মৃদু স্বরে সে বলিল, "এত বেলা হয়ে গিয়েছে!" কথাটা জ্যেঠাইমার কর্ণে গেল। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আলো ধর গো, মেয়ে অন্ধকারে দেখতে পাচ্চে না।" সতী দোষ করিয়াছে দেখিয়া সে কথার আর কোন উত্তর দিল না। মাতাকে উঠাইয়া দিয়া আপনি বাসন মাজিতে বসিয়া গেল। জাহ্নবী বলিলেন, "তবে আমি নেয়ে আসি?"

"যাও"।

ভট্টাচার্য্য মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র হরিশঙ্কর আসিয়া বলিল, "টোলে না গেলে কেবল

বকৃতে পারি, কিন্তু আর কিছুরি বেলায় আক্কেল দেখতে পাই না। শুধু-পায়ে পাঁচটা ছেলের মধ্যে যাওয়া যায় কি? আমার চটী চাই—আজই চাই।"

জাহ্নবী আসিয়া পুত্রের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "হরি, এখন ও সব কথা বলো না, বাবা। এখন অমনি যাও, এর পরে—"

"এর পরে কি? ক'দিন এ রকম করে যাওয়া যায়! বাবা, আজই আমার চটী চাই।"

রামশঙ্কর একটু উগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "গরীবের ছেলের অত বড়মানুষী কেন? যাদের যেমন অবস্থা, তারা তেমনিভাবে চলবে! আমি তোদের দায়ে চুরি করতে যাব না কি?"

জ্যেঠাইমা অমনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা ওরা কি জানে! না দেবে ত বাপ হয়েছিলে কিসের জন্যে? যুগ্যি ছেলে অমনি মাথা হেঁট করে থাকে, তা লজ্জা হয় না?" তিন বৎসর বয়স্ক কালীশঙ্কর আসিয়া মাতার আঁচল ধরিয়া বলিল, "মা, ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দে মা।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ত্বরিত পদে গৃহের মধ্যে গিয়া আলনা হইতে চাদর গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবীও গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "চাদর নিয়ে কোথায় যাবে?"

ভট্টাচার্য্য অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া জাহ্নবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠানে নামিলেন, কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

"কিছু উপায় করতে পারি ত ফিরব, নইলে এই শেষ, জাহ্নবী।" বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

জাহ্নবী ব্যাকুল কণ্ঠে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, "হরি, যা,

যা। কোথায় যাচ্চেন ছাখ্, বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। যা হরি যা"।

"যাবেন আবার কোথায়! আপনি ফিরে আসতে হবে। আমি চাঁদপুরে নরেনবাবুদের বাড়ী চললুম, তিনি আমায় সেখানে কত থাকতে বলেন, আমি তোমাদের কথা মনে করেই থাকি না। তা আজ থেকে এই বিদায় হচ্চি। এ বাড়ীর অন্ন যে ছোঁয়, সে চামার।"

জাহ্নবী বাক্‌শক্তি-রহিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতী বাসন মাজা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রাতাকে বলিল, "ছি, ছি, দাদা, তুমি হলে কি? তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে! যেয়ো না, ছি, ফেরো। তোমরা যদি আমাদের এমন করে ফেলে যাবে ত আমাদের গতি কি হবে! ফেরো; বাবাকে ফেরাও।"

"তোদের যা খুসী কর্‌গে, আমি নিশ্চয়ই যাব"।

বলিতে বলিতে হরিশঙ্কর বাটীর বাহির হইল। সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া ভ্রাতার দুই হস্ত ধরিল, "দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, রাগ করো না, বাবাকে যেতে দিয়ো না, বাবাকে ডেকে আন গে।"

বালিকাকে সজোরে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া হরিশঙ্কর চলিয়া গেল।

জাহ্নবী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে উঠানে বসিয়া পড়িলেন, মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবরিত। সতী চিত্রপুত্তলির মত ছাইমাখা হাতে দাঁড়াইয়া রহিল। সাবিত্রী আবার গিয়া ঘর নিকাইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু হাতের কার্য্য চোখের জলে সে দেখিতে

পাইতেছিল না। কেবল জ্যেঠাইমা উচ্চ চীৎকার ও ক্রন্দনে পাড়াশুদ্ধ লোককে ব্যাপারটা জানাইতে লাগিলেন।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মনের বেগে গ্রাম-প্রান্তের রাস্তা দিয়া একেবারে মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। সত্যই তিনি যে দিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকে যাওয়ার মতই চলিতে লাগিলেন। আলে পা বাধিয়া হুঁচট খাইতেছেন! পদে কণ্টক বিদ্ধ হইতেছে, কিছুই গ্রাহ্য নাই! পাশের জমিতে পরাণ মণ্ডল বসিয়া ভুঁই নিড়াইতেছিল। সে বলিল, "ঠাকুর, এ দিকে এমন করে কোথায় যাচ্চেন?"

"যমের বাড়ী।" বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিতে লাগিলেন।

"ভট্চাজ মশায়! এ দিকে—অমন করে কোথায় যাচ্চেন?"

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পাড়ার বিশ্বেশ্বর মৈত্র। কোঁচা ও পায়ের কাপড় একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া ঢেলাভূমি ভাঙিতে ভাঙিতে সে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পাছে কাহারো সঙ্গে দেখা হয় বলিয়া তিনি বিপথ ধরিয়াছিলেন, দেখিলেন, তাহাতেও নিস্তার নাই। বিশ্বেশ্বর নিকটে আসিয়া সসম্মানে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "এ দিকে কোথায় যাচ্চেন?"

"কোন দিকের প্রতি আমার পক্ষপাত নেই—এক দিকে যা হোক, যাচ্চি, দেখতেই ত পাচ্চ, বাপু।"

"এ দিকে ত পথ নেই—মানুষ চলে না—আপনি এ দিকে কোথায় যাবেন?"

"কেন বাপু, এই ত তুমি চলছ, মানুষ চলে না, বলছ, কি করে?"

"আমার কথা ছেড়ে দিন। সোজা রাস্তায় ফিরতে দেরী হবে বলে এই দিক দিয়ে যাচ্ছি।"

"আমারও তাই, মনে করে নাও না কেন।"

"আমি তারাপুরের মহাজনদের কুঠিতে গেছলুম—একটা কারবার কারবার চেষ্টায়। ফেরবার সময় রাস্তা কম হবে বলে এই পথ দিয়ে চলছি।"

"আমিও যাহোক একটা কিছু কাজেই চলেছি বাপু, বিনা কাজে কে কবে মাঠ ভাঙে?"

"ভট্‌চায মশায়, আপনি লুকুচ্চেন। যদি বলবার মত হয় অনুগ্রহ করে বলুন না কেন। আমি আপনার স্নেহের পাত্র, সন্তান-তুল্য, আমার কাছে সঙ্কোচ করবেন না।"

"সঙ্কোচ কিসের বাপু, সঙ্কোচ কিসের?"

"আমি যদি আপনার সামান্য উপকারে লাগি ত নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করব।"

ভট্টাচার্য্য একবার স্থির নেত্রে যুবার মুখের দিকে চাহিলেন। অতি সরল উদার আগ্রহপূর্ণ মুখ,—ব্যঙ্গ বা ছলনার চিহ্নমাত্র তথায় নাই। ভট্টাচার্য্য মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি যে রকম ছেলে, তাতে এ কথা যে তোমার যোগ্য, তা জানি; কিন্তু বল দেখি, আমি কেন তোমার উপকার গ্রহণ করব? আমি কার কি উপকার করেছি যে, অন্যের উপকার নেব?"

"উপকার নয়। স্নেহের বশে—স্নেহের জোরে নেবেন।"

"ও কথাই নয়। শোন তবে, আমি বাড়ী থেকে একটা কিছু উপায়ের চেষ্টায় বেরিয়েছি। কিছু উপায় না হয়, নিজের একটা উপায়ও ত করে নিতে পারব।"

বিশ্বেশ্বর ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল। ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "কি উপায় খুঁজতে যাচ্চেন—কোন কাজ-কর্ম্মের সন্ধানে কি?"

"প্রথম তাই।"

"আচ্ছা, আমার উপকার না নেন, তারাপুরের কুঠীতে চলুন, টাকা দশেক মাইনের একটি কর্ম্মচারী চাই। সে কাজ করতে পারবেন?"

"এখনি। মাইনেটা কিন্তু এ মাসে আমায় আগাম—আজকেই দিতে হবে।"

"আচ্ছা, আসুন।"

উভয়ে চলিলেন। বিশ্বেশ্বর শুধু একবার অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। অবস্থাটা, অনুভবে, সে বুঝিতে পারিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্বেশ্বর নিতান্তই একজন গ্রাম্য যুবক। তাহার পিতা গ্রামের মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন, কিন্তু বাহ্যিক চালচলনে ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পাইত না। কৃপণ বলিয়াই বরং তাঁহার অখ্যাতি জন্মিয়াছিল।

সামান্য একতালা বড় বাড়ী, অনেকগুলি গরু, বাছুর, গাড়ী, বলদ প্রভৃতিতে গোয়াল পরিপূর্ণ এবং ধান্য, যব, গম প্রভৃতির প্রাচুর্য্যে গোলাবাড়ীতে পা দিবার ঠাঁই নাই। অথচ তেমন বেশী চাকর-চাকরাণী বা রাঁধুনী-খানসামারও ধুম নাই। টেবিল-চেয়ার,

আয়না-দেরাজে বৈঠকখানাও সজ্জিত নয়,—নিতান্তই সাদাসিধা গ্রাম্য গৃহস্থের বাটী।

লোকে কিন্তু বলিত, বুড়া টাকার কুমীর। সংসারে তাঁহার একমাত্র পুত্র বিশ্বেশ্বর ও তাহার মাসী অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী। মাসীও অত্যন্ত ধনবতী বলিয়া প্রবাদ আছে। মাতৃহীন বিশ্বেশ্বরকে পালন করিতে যখন তিনি নারায়ণচন্দ্র মৈত্রের গৃহস্থালীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, লোকের হৃদয়ে তখন একটা ঈর্ষার তুফান উঠিয়াছিল।

একমাত্র পুত্র বলিয়া নারায়ণ মৈত্র বিশ্বেশ্বরকে কখনও চক্ষের আড় করিতে পারিতেন না। সেজন্য বিশ্বেশ্বর গ্রাম্য স্কুলে এণ্ট্রেন্স অবধি পড়িয়াছিল মাত্র। কিন্তু লোকে বলাবলি করে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে না পড়িলেও সে যথার্থ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত উপাধিধারী বহু বিদ্যার্ণব-বিদ্যাবাগীশ-তর্কচঞ্চু-সরস্বতীর দল তাহার সংস্কৃত-জ্ঞানের নিকট পরাজিত হইত। এবং একজন এম এ উপাধিধারী দিগ্‌গজ পণ্ডিতও নাকি একবার বাবুদের বাড়ীতে আত্মীয়তা-সূত্রে বেড়াইতে আসিয়া এই গ্রাম্য যুবকটির অসাধারণ ভাষাজ্ঞান দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ নানা প্রকার গুজবে বিশ্বেশ্বরের নাম গ্রামের পুরুষ-মহলে সমধিক প্রচারিত ছিল, কিন্তু মেয়েমহলে এ সকল উড়ো কথা স্থান পাইত না! কেন না, তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত মুখচোরা ভালমানুষ, তবে সুছেলে বটে!

বলিতে গেলে বিশ্বেশ্বরকে গ্রামের লোক বেশীর ভাগ কেহ বড়-একটা দেখিতেই পাইত না। দ্বাবিংশ বৎসরের অধিকাংশ কালই তাহার নিজের গৃহকোটরটীর মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে।

সমবয়সী যুবকদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া বেড়ান, বা লম্বা রকম গল্পগুজব করা জীবনে তাহার কখনও ঘটে নাই। ষোল বৎসর বয়সে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া স্কুল ছাড়িয়া সেই যে সে নিজের কক্ষে ঢুকিয়াছে, স্নানাদি সময়ে ভিন্ন এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে বড় একটা বাহিরেই দেখে নাই। অন্তঃপুরস্থ সে কক্ষে কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। থাকিলে দেখিতে পাইত, তক্তার উপর রাশি রাশি পুস্তক এবং মেজের উপর মাদুরে উপবিষ্ট যুবক পাঠে আপন চিত্ত সম্পূর্ণ ঢালিয়া দিয়াছে। এ বিষয়ে পিতারও ব্যয়কুণ্ঠতা ছিল না এবং পুত্রের এরূপ স্বভাবে তিনি যথেষ্টই সুখ বোধ করিতেন। সংসারের কোন চিন্তা এ পর্য্যন্ত পুত্রকে তিনি ভাবিতে দেন নাই। ইচ্ছা ছিল, বিবাহ দিয়া পুত্রকে সংসার বুঝাইয়া শেষ অবস্থায় তিনি কাশীবাসী হইবেন। কিন্তু সহসা কাল আসিয়া নোটীস জারি করিল। পুত্রকে এক প্রকার সব বুঝাইয়া দিয়া ও তাহার মাসীর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের অভিনয় একদিন শেষ করিয়া গেলেন।

বিশ্বেশ্বর প্রথমটা দিশাহারা হইয়া পড়িল। সাহিত্যের নিভৃত কোটর হইতে একেবারে সংসারের মধ্য স্থলে একাকী অসহায়ভাবে তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া পিতা কোথায় সরিয়া গেলেন! এ যেন তাহার নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ হইল!

কিন্তু সংসার তাহার পক্ষে জটিল নহে, পিতার শৃঙ্খলাও ছিল চমৎকার এবং তাঁহারি হাতে-গড়া বিশ্বেশ্বরের মস্তকটিও ততোধিক পরিষ্কার। ইতিপূর্ব্বে সে যেমন অবাধে সাহিত্য-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইত, সংসারেও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে সে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সংসারের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও তাহার বোধ হইল, যথেষ্ট সময় আছে! সে সময়টুকু কিরূপে সে কাটাইতে পারে, তাহারই সে উপায় দেখিতে লাগিল। কারবারটা বাড়াইয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া, কতকগুলা নূতন জমি ও বাগান কিনিয়া তাহার উন্নতিসাধন করিয়া, সম্প্রতি সে নদীর ধারে অনেকখানি জায়গায় কি একটা অভিপ্রায়ে দীর্ঘ একখানা গৃহ নির্ম্মাণের বন্দোবস্তে ঝুঁকিয়া পড়িল। ইতিমধ্যে গ্রাম্য-দেবতা ভবানী-মন্দির-সংস্কার-কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, লুপ্তাবশেষ বৃহৎ 'কালী সাগরের' পঙ্কোদ্ধার হইয়া পুষ্করিণী জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। মহিমাপুরের ভাঙ্গন বাঁধটা প্রতিবার ভাঙ্গিয়া গ্রাম জলে প্লাবিত হইয়া যায়, তাহারও বিশেষরূপে সংস্কার হইতেছে। কে এ সব করিতেছে, সকলে তাহা জানিত না, কিন্তু তথাপি কেহ কেহ বলিত, কৃপণ নারায়ণ মৈত্রেরই অর্থগুলার সদগতি হইতেছে। কোন কোন পরহিতাকাঙ্ক্ষী সাধু বিশ্বেশ্বরকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিত, "বাপু, পরের কাজে গোঁজা না দিয়ে নিজের একটা বড় কিছু কর না কেন, নামটাও থাকবে, ভালও হবে।" বিশ্বেশ্বর সে কথা উড়াইয়া দিয়া বলিত, "অত বড় বড় কীর্ত্তি করা কি আমার সাধ্য! দু চার টাকায় যা হয়, সেই পর্য্যন্ত।" যিনি একটু বিচক্ষণ, তিনি বলিতেন, "সে কি বাপু, এ সব কাজে যে বিস্তর টাকা ব্যয় হচ্ছে।" বিশ্বেশ্বর তাচ্ছল্যের সহিত মাথা নাড়িয়া বলিত, "কোথায়! বেশী খরচ করা কি আমার সাধ্য!"

মাসিমাতা অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এতদিন স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালীর সমস্ত ভারই বহন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সহসা একদিন একটা জায়গায় তাঁহার যেন একটু বেখাপ্পা ঠেকিল। তাঁহাদের এই নিস্তব্ধ

ছোট, সুখে-দুঃখে মিশ্রিত সংসারটি একটু নূতনত্বে ভরিয়া উঠে, এমনই তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল। পুত্রস্থানীয় বিশুকে একদিন ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "গ্যাখ্ বিশু, আমার একটা সাধ হয়েছে।"

"কি মাসিমা ?"

"সকলের বাড়ীই কেমন ছোট ছোট বউঝিতে আলো করে থাকে, আর আমার ঘর একেবারে ফাঁকা।"

"কি করবে বল, মাসিমা—মানুষ ত' ফরমাসে গড়ে না। ভগবান দেন্ নি, উপায় কি ?"

"তা বলে একটা মানুষকে ত' ফরমাসে গড়েই লোকে সংসারে আনে। আমায় একটি টুকটুকে বউ এনে দে না কেন।"

মাসিমার সাধ শুনিয়া বিশ্বেশ্বর হাসিয়া আকুল হইল। সে হাসি আর থামে না। মাসী রাগিয়া বলিলেন, "এত হাসি কিসের, বল্ দেখি, বাপু! এখন যে বউ না আন্লে লোকে নিন্দে করবে।"

"মাসিমা, আপনার নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা মানুষের স্বভাব! পরের মেয়ে ঘরে এনে কেন বল দেখি, একটা জঞ্জাল করা! আমরা মায়ে-পোয়ে কি মন্দ আছি ?"

"মন্দ কেন থাক্‌ব! কিন্তু এর মধ্যে আর একটি এলে আরও ভাল থাকব।"

"একটি এলে বলবে, আর একটি, তারপর আর একটি! মানুষের ইচ্ছে কেবলই বেড়ে চলে। তার চেয়ে ভগবান যে ক'টিকে জন্মাবচ্ছিন্নে এক জায়গায় রেখেছেন, সেই ক'টিকে নিয়েই সুখে স্বচ্ছন্দে থাক।"

"এমন ক্ষেপা ছেলেও ত' দেখিনি। ও সব আমি আর শুনছি না। আমি মেয়ে ঠিক্ করব, বলে রাখ্‌ছি।"

"তা তুমি যত ইচ্ছে, মেয়ে ঠিক কর না, কেন! আমিও তোমায় চার-পাঁচটার সন্ধান দিতে পারি।"

"তা বেশ ত, বল্ না। ওর মধ্যেই একটিকে পছন্দ করে নিলে চলবে।"

"বাঃ, একটিকে পছন্দ করবে, আর বাকীগুলি বুঝি ফিরে যাবে! তা হবে না, মাসিমা, সবগুলোকে নিতে হবে। তা হলে বউয়ে-ঝিয়ে তোমার বাড়ীও খুব জাঁকিয়ে উঠ্‌বে।"

"ক্ষেপামী রাখ্। সত্যি করে বল্, বিয়ে এখন করবি কি না।"

"আমার মত নিয়ে কি তুমি মত করছ! তুমি যত পার, বাড়ীতে বউ-ঝি আন। আমি কিন্তু বলে রাখছি, পশ্চিমের সব দেশ একবার দেখতে যাব। তুমি কাশী বৃন্দাবনের গল্প কর, আমি কেবল শুনে যাই, এবার আমি ঘুরে এসে তোমায় ঠকিয়ে দেব। প্রথমে বাবার গয়া করতে হবে। তুমি যদি সঙ্গে না যাও মাসিমা, তাহলে আমায় না খেয়েই শুকিয়ে মরতে হবে, দেখছি।"

"আমি কি বল্‌ছি, তোর সঙ্গে যাব না, না, তোকে একা ছেড়ে দেব! কিন্তু বিয়েটা করে গয়া করতে গেলে হ'ত না, বিশু?"

"তা হলে আমি একাই যাই, তুমি বিয়ের বন্দোবস্ত কর!"

"তুই না থাকলে কার বিয়ের বন্দোবস্ত করব রে?"

"সে তুমিই জান।"

"এমন ছেলে ত কখনো দেখিনি, বাপু। আচ্ছা, চল্, আগে ঐ গুলোই না হয় সেরে আসা যাক।"

এ সব কথা এই অবধিই স্থগিত রহিল। বৈকালে বিশ্বেশ্বর তাহার নবরচিত কলা-বাগানের তত্ত্বাবধান সারিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় একটি মেয়ে তাহার সম্মুখে পড়িল। একটি ক্ষুদ্র মৃৎ-কলসে সে জল লইয়া যাইতেছিল। বালিকা তাহাকে রাস্তা দিবার জন্য ক্ষুদ্র পথের পার্শ্বে কচলার গায়ে ঘেঁষিয়া যাওয়াতে বিশ্বেশ্বর শশব্যস্তে বলিল, "অত বিপথে যাচ্ছ কেন? এ সময় ওখানে সাপ-টাপ থাকতে পারে, রাস্তায় দাঁড়াও না!"

বালিকা একটু হাসিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি তবে কেন অত পগারের মধ্যে নাম্‌ছেন?"

বিশ্বেশ্বর সে কথার উত্তর না দিয়া "রাস্তা দিয়ে যাও" বলিয়া বালিকার পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল। বালিকা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া বিশ্বেশ্বর রাস্তার বাঁক ফিরিতে গিয়া দেখিল, বালিকা তখনও পূর্ব্ব স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া একটু দাঁড়াইল; দেখিল, বালিকা তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিল, চাহিবামাত্র সে দৃষ্টি নামাইল। সহসা তাহার মনে হইল, হয়ত তাহারই কাছে বালিকার কিছু প্রয়োজন আছে। পরক্ষণেই মনে হইল, মেয়েটি যেন চেনা-চেনা। কে, বা কাহার কন্যা, তাহা মনে পড়িল না, কিন্তু ইহাকে যে সে দুই-তিন বার দেখিয়াছে, তাহা মনে পড়িল। কৌতূহলী হইয়া বিশ্বেশ্বর বালিকার নিকট ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাদের মেয়ে?"

"ভটচায্যিদের।"

"কোন্ ভট্‌চায? রামশঙ্কর ভটচায্যের মেয়ে তুমি?"

"হ্যাঁ।"

বিশ্বেশ্বর দেখিল, বালিকা আর কিছু বলে না; অগত্যা সে ফিরিয়া চলিল। নিজে হইতে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কেহ কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে অথচ সঙ্কোচে পারিয়া উঠিতেছে না, তাহা বুঝিয়াও সে তাহার কোন সদুপায় ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না; নিজেও এক রাশ সঙ্কোচ লইয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায়। তবে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে যে সেদিন ওরূপে সে বলিতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ, সে তাহার মাসীর কাছে তাঁহার দুরবস্থার কথা কিছু-কিছু শুনিয়াছিল এবং তাহার তরুণ কোমল মনে সে কথাটা জাগিয়াই ছিল। মনেও সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল যে, রামশঙ্কর বা তাহার পুত্র, কাহাকেও একটা কার্য্য দিতে পারিলেই তাহাদের দুঃখ দূর হইবে। ভদ্রসন্তান কেহ যে তাহার কাছে অর্থ প্রত্যাশা করে বা তাহার কাছে সংসারের লোক যে কেহ কখনও কোন দাবী রাখে, তাহা সে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিতে পারে নাই। সে কথা ভাবিতেও তাহার মনে সঙ্কোচ হইত। ভট্টাচার্য্যের চাকরীর ঠিক করিয়া দিয়া সে আর তাঁহার কোনই খোঁজ রাখে নাই। দুই দিনের চিন্তা তাহার এক দিনেই মিটিয়া গিয়াছিল।

বিশ্বেশ্বরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সতী আবার তাহার পানে চাহিল। অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে—আপনাকে—"

বিশ্বেশ্বর আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, "আমায় বল্‌ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কি, বল?"

সতী সঙ্কোচে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, অথচ না বলিলেও নয়, সখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয় এবং হয়ত সখীর সম্বন্ধে

একটু অন্যায়ও করা হয়। ব্যাপার বুঝিয়া বিশ্বেশ্বর আর একটু নিকটে আসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "বল না, লজ্জা কি?"

সতী অনেক কষ্টে বলিল, "কমলা আপনাকে বলেছে—"

"কমলা? কমলা কে?"

সতী একটু বিস্মিত, একটু দুঃখিতভাবে বলিল, "তাকে চেনেন না?—বাবুদের বাড়ীর মেয়ে, যাকে আপনি একবার জল থেকে তুলেছিলেন?"

বিস্মিত বিশ্বেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ওঃ, সে ত অনেক দিনের কথা। তা কি?"

"কমলা বলেছে—আপনাকে—আপনার নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে?"

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া ফেলিল, মাসিমার ইচ্ছাটা ইহার মধ্যেই যে গ্রামে রটিয়া গিয়াছে, তাহাতে সে খুব আমোদ বোধ করিল। হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "হ্যাঁ, তা হচ্ছে বৈকি! তাতে হয়েছে কি?"

সতী যতদূর সম্ভব মস্তক নত করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "কমলা বলেছে, সে আপনাকে বিয়ে করবে।"

সতীর এই অদ্ভুত কথায় বিশ্বেশ্বরের বিস্ময়ের চেয়ে হাসির মাত্রাটাই অধিক দেখা দিল, কিন্তু সতীর লজ্জা দেখিয়া সে বুঝিল, তাহার সমক্ষে এতটা হাসি সঙ্গত নহে, তাই সে বলিল, "কেন, তার কোথাও বিয়ের কথা হচ্ছে না, বুঝি?"

সতী ঠাট্টাটুকু না বুঝিয়া সরল ভাষায় বলিল, "হ্যাঁ, চাঁদপুরের জমিদারদের বাড়ী। সে তা করবে না।"

"সত্যি না কি?"

"হ্যাঁ।"

বিশ্বেশ্বর গম্ভীর মুখে বলিল, "সেইখানেই তাকে বিয়ে করতে বলো। গাঁয়ে খুব ঘটা হবে, আমরা কত ভোজ-ফলার খাব, আশা করছি; তারা খুব বড় লোক।"

সতী লজ্জাস্নিগ্ধ নেত্রে বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া বলিল, "আপনারাও ত বড়লোক, খুব ঘটা করতে পারবেন।"

"পাগল হয়েছ, তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা!"

"কমলাকে কি বল্‌ব?" বিশ্বেশ্বর আবার হাসিয়া ফেলিল। অতি কষ্টে মুখ গম্ভীর করিয়া সে বলিল, "বলো যে, আমায় যদি বর হতে হয়, তা হলে সে বিয়ের ভোজ-ফলার কিছুই আমি খেতে পাব না। উপোস করে মরতে হবে, খালি! অনেক দিন থেকে আঁচ করে আছি, এ বিয়েটায় খাব খুব। কাজেই বর হতে পাচ্ছি না,—বুঝেছ?"

সতী দুঃখিত হইল, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের কথা শুনিয়া তাহার হাসিও পাইল। সে বলিল, "আপনি ঠাট্টা কচ্চেন!"

"না, না, সত্যিই বলছি। তার কথা রাখতে পার্‌লাম না বলে আমি দুঃখিত হচ্চি। কিন্তু কি করি বল, খাওয়াটার আশাও কোন মতে ত্যাগ করতে পাচ্চি না।"

সতী তখন গমনোন্মুখী হইল। বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "তোমার নাম কি?"

"সতী!"

"তোমার দাদা বাড়ী এসেছে? তোমার বাবা সেদিন বলছিলেন—"

"হ্যাঁ—" বলিয়া সতী কিছুদূর চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর

সসঙ্কোচে-জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা তারাপুরের কুঠিতে রোজ যান ?"

চলিতে চলিতে সতী বলিল, "যান ।"

বিশ্বেশ্বরের আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, তাহাদের কোন অভাব, কোন কষ্ট আছে কি না,—কিন্তু সে কথার প্রারম্ভেই সতী চঞ্চলভাবে চলিয়া গেল এবং তাহার নিজেরও সঙ্কোচ কাটিল না, জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সেই দিনের পর আর তাহার সহিত সাক্ষাতাদিও করেন নাই এবং পাছে তিনি কিছু মনে করেন, এজন্য দুই একদিন ইচ্ছা হইলেও সে তাঁহার নিকট যাইতে পারে নাই। শেষে তাঁহার আর কোন উচ্চ-বাচ্য নাই দেখিয়া সে বুঝিল যে, তাঁহার আর কোন অভাব নাই। সে দিন সেই অনাহারী পরিবারকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের একটা পথ যে সে দেখাইয়া দিতে পারিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া ভগবানের উদ্দেশে সে প্রণাম করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মাসে দশটা করিয়া টাকা আনিয়া দিয়া ভাবিলেন যে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণের সকল ঋণ হইতে তিনি মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিবার বা করিবার তাঁহার আর কিছুই নাই। তাই তিনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে যথাসময়ে স্নানাহার সারিয়া দুই-তিন ছিলিম তামাকু পুড়াইয়া একটু নিদ্রা দেন, পরে উঠিয়া সযত্ন-সংস্থাপিত জলে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া কাপড়-চাদরটা

একটু ঝাড়িয়া পরিয়া কাজে বাহির হন্। রাত্রি আটটা নয়টার সময় গৃহে ফিরিয়া পুনর্ব্বার সযত্ন-সজ্জিত ঈষদুষ্ণ অন্ন-ব্যঞ্জনে শ্রান্তি ঘুচাইয়া আরামে নিদ্রা দেন।

পুত্র হরিশঙ্কর অনেক দিন হইল, টোল ছাড়িয়া দিয়াছে, চাঁদপুরের বাবুদিগের সংসর্গেই তাহাকে অধিক দিন থাকিতে হয়; কেন না, তাঁহাদের সখের থিয়েটারে সে একজন অত্যন্ত গৌরবের সামগ্রী। নারী-চরিত্রের ভূমিকা অভিনয় করিতে সে একেবারে অদ্বিতীয় এবং তাহাকে মানায়ও বেশ। সেজন্য বাবুরাও তাহাকে ছাড়িয়া দেন না। মাসের মধ্যে যে দুই দিন সে বাড়ীতে আসে, সে দুই দিন, মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীকে নাকের জলে চোখের জলে ভাসাইয়া নিজেও ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া চলিয়া যায়। এ কদর্য্য গৃহের কদর্য্য অন্ন-ব্যঞ্জন, কদর্য্য শয্যা তাহার আর পছন্দ হয় না। সেজন্য ভট্টাচার্য্যও বিশেষ দুঃখিত নহেন। বড়লোকের নজরে পড়িয়া শেষে উহার হয়ত একটা ভালরকম কাজকর্ম্ম জুটিতে পারে ভাবিয়া এবং পুত্রের টেরি, ছড়ি, ধুতি, সার্ট ও সিগারেটের বাহার দেখিয়া পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে তিনি তামাকু টানিতে থাকেন। কেবল জাহ্নবী দেবী বিরলে চক্ষু মুছেন, মাতার অশ্রু দেখিয়া মেয়ে দুইটিও কাঁদিয়া ফেলে।

বিশ্রাম ছিল না, শুধু এই তিনটি প্রাণীর। সাংসারিক কর্ম্মের অবসরে জাহ্নবী তুলা পেঁজা, পৈতা কাটা, পাটের দড়ি কাটা প্রভৃতি অনেক কার্য্য করিতেন। কন্যাদুইটিও নীরবে মাতার কর্ম্মে সাহায্য করিত। জাহ্নবী সূচের কাজ খুব ভালই জানিতেন। কিন্তু তাহাতে পয়সায় কুলায় না, কাজেই এই

অল্পব্যয়সাধ্য কার্য্যের দ্বারা সংসারের অভাব তিনি কোনরূপে পূরণ করিয়া লইতেন। দশটি টাকায় সকল খরচ কিছু সংকুলান হয় না। তাহা ছাড়া ভবিষ্যতের জন্য, সময়-অসময়ের জন্যও ত কিছু সঞ্চয় রাখা প্রয়োজন। স্বামীর ত এই রুগ্ন অবস্থা, তিনি হাঁপের রোগী। কন্যা দুইটী বড় হইল। রূপ থাকিলে কি হইবে, রূপ গুণ যাহাতে ঢাকিয়া যায়, গৃহে যে তাহারই অভাব! কে তাহাদের বিবাহ করিবে আর কেই বা বিবাহের চেষ্টা করে! জাহ্নবী নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে স্মরণ করেন।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর। তাহাদের বাসন-মাজা ঘরনিকানো প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়াছে। বিড়ালটা আরামে তুলসীতলায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে, কুকুরটা দাওয়ার নীচে শুইয়া পড়িয়াছে। উঠানে মাচায় লাউ-কুমড়ার পাতাগুলা রৌদ্রে যেন নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে, পরিষ্কার 'নিকানো-পোঁছান' উঠানটির একধারে কলাগাছের ঝাড়টি সতেজে রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া শ্যাম কান্তিতে দর্শকের চক্ষু জুড়াইয়া দিতেছে। উঠানের আমগাছে পাকা আমগুলি টুকটুকে হইয়া ঝুলিতেছে। গাছের পত্ররাশির মধ্য হইতে পক্ক আম্রস্বাদে তুষ্ট কোকিল এক-একবার সাড়া দিতেছে, কু-উ-কু-উ। জাহ্নবী কতকগুলা পাট বাহির করিয়া আনিয়া জলে নরম করিতে লাগিলেন, সাবিত্রী সেগুলা গুছাইতে লাগিল। সতী একবার মাতার পানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "মা, কমলা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে,—একবার যাব?"

"যাও, কিন্তু বড় রোদ্দুর মা, একটু পরে গেলে হত না?"

"তা হোক্, বেলা গেলে পথে লোক হয়। সাবিত্রী, যাবি?"

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

"তবে আমি কার সঙ্গে যাই মা? একা যাব?"

মা বলিলেন, "সাবিত্রী, যা না মা। সতী একা যাবে কি করে?"

সাবিত্রী রৌদ্রতপ্ত রাঙা মুখখানি ফিরাইয়া, ললাট হইতে রুক্ষ চুলের গোছাটা পশ্চাতে সরাইয়া ফেলিয়া মিনতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল, "তুমি কালীকে নিয়ে যাও না, দিদি। আমি আজ মার সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কেটে দেখ্‌ব, পারি কি না। তাই আজ যাব না।"

ভ্রাতা কালীপদকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া ও তাহার মস্তকে একখানা গামছা জড়াইয়া সতী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বাটীর বাহির হইল। মা ডাকিয়া বলিলেন, "একখানা গামছা মাথায় দিলি না, সতী?—রোদ্দুর লাগ্‌বে যে। সতী সে কথায় মন না দিয়াই চলিয়া গেল।

বড়লোকের বাড়ী। প্রবেশ করিতেই পা যেন কাঁপিয়া উঠে! আজ প্রায় দুই বৎসর হইল, কমলা শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাওয়ার পর সে আর এ বাড়ীতে আসে নাই। তখনকার অপেক্ষা বয়স এখন বেশী হইয়াছে, সঙ্কোচও বাড়িয়াছে। ধনগর্ব্বিতারা সহজে কেহ কথা কহেন না অথচ চাহিয়াও দেখেন। সতী মনে মনে ভাবিল, আর কোনদিন আসা হইবে না।

কিন্তু কমলা যখন ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা ধরিল, তখন সতীর সমস্ত বিরাগ ভাসিয়া গেল। এ দুই বৎসরে কমলা আরও সুন্দর হইয়াছে, মোটা হইয়াছে। বস্ত্রে আভরণে সৌভাগ্যের দীপ্তিতে সর্ব্ব শরীর ঝলমল্ করিতেছে। সতী কথা কহিল না, শুধু মুগ্ধ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। কমলাও প্রথমটা কথা কহিতে পারিল না, এ যেন সে সতী নয়।

দারিদ্র্যের মধ্যেও সেই গর্ব্বিত-সুন্দর মুখখানি কে যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছে। মাথায় খানিকটা সে লম্বা হইয়াছে কিন্তু একটু কৃশ। রুক্ষ একরাশি চুল তাহার ক্ষীণ সুকুমার সৌন্দর্য্যের ছায়ার ন্যায়ই তনুখানিকে বেড়িয়া রহিয়াছে। অধরে শান্ত হাসি কিন্তু উজ্জ্বল আয়ত চক্ষু ম্লান বিষাদ-ময়। কমলা তাহার গলা বেড়িয়া ধরিয়া বলিল, "এত কঠিন হয়েছিস্ লো,—আজ তিন দিন এসেছি, মোটে আট দিনের কড়ারে। আমি যদি যেতে পেতুম ত' এসেই ছুটে চলে যেতুম। তোর কিন্তু ধন্যি প্রাণ!" সতী একটু হাসিল।

কমলা আবার বলিল, "এত রোগা হয়ে গেছিস্ কেন, ভাই?"

"রোগা কোথায়! আজ কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা?"

"প্রায় দু বছর হতে চল্‌ল আর কি। এমন জায়গায় গিয়ে পড়েছি ভাই, যে, একদিনও কোথাও যাবার জো নেই। এই কত সাধ্য-সাধনা করে তবে এসেছি।" বলিয়া কমলা একটু হাসিল। হাসি দেখিয়া সতীও একটু হাসিল। বলিল, "কার সাধ্য-সাধনা করে আসতে পেলি? বাড়ীর লোকের?"

"কার আবার? শ্বশুর-শাশুড়ী কি তাঁদের ছেলেদের ওপর কথা কইতে পারেন? আমার জা কিন্তু মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যেতে পায়, আমার ভাগ্যে আর তা হয় না। আমার জাকে আমি বলি, তাতে সে কত ঠাট্টা করে, বলে, এখন নতুন কি না! এর পর কিছু থাকবে না, আমাদেরও নতুনে অমন ছিল লো! কি মানুষ ভাই! বাপের বাড়ীও আসতে দেবে না!"

উভয়ের গল্প চলিতে লাগিল। কমলার সুখ-সৌভাগ্যের বর্ণনা শুনিয়া সতী সত্যই আনন্দিত হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বের ঘটনাটা তাহার মনের মধ্যে এক-আধবার জাগিত। না জানি,

কমলা কেমন আছে, ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। বিবাহের সময় কমলার ম্লান মুখ ও বিরক্তিপূর্ণ ভাবে সতী মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের প্রতিও মনে বড় রাগ ধরিয়াছিল।

এতদিনে সে আশঙ্কা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু ভারী একটা কৌতূহল মনের মধ্যে নড়িয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু অনুচিত ভাবিয়া সে ইচ্ছা সে সম্বরণ করিল। বহু গল্প-স্বল্পের পর কমলা বলিল, "নিজের কথাই কেবল বলে যাচ্চি—তোর কথা কিছু বল্।"

"আমার কি কথা!"

"বিয়ের কথা! আর কত দিন আইবুড় থাক্‌বি—বিয়ে হবে না?"

সতী একটু হাসিল। "হাস্‌লে হবে না—বল্ না, বিয়ের কথা কিছু হচ্চে না?"

"আমি তার কি জানি!"

"কচি খুকী আর কি! বয়সের যে গাছ-পাথর নেই।"

"তা কি কর্‌ব! বিয়ে কি অমনি বল্লেই হয়, কমলা? বাপ মা আগে পাগল হয়ে উঠ্‌বেন, ঘর-দুয়োর সব বিক্রী হবে, সবাই গাছতলায় দাঁড়াবে, তবে ত' বিয়ে হবে।"

"আঃ, কি বলিস্, তার ঠিক নেই! এত সুন্দর তুই, কত লোকে আদর করে নেবে!"

"তুই নিবি? নিস্ ত বল্।" বলিয়া সতী হাসিল, কিন্তু সে হাসি দেখিয়া কমলার চক্ষে জল আসিল। ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলিল, "তাই ত ভাই, তবে উপায় কি হবে?"

"কিসের উপায়! এমনি থাক্‌ব, আর বাপ-মার বুকের রক্ত

জল করব। যেমন আছি, তেমনি থাক্‌তে যে আমার বেশী অসাধ, তা ভাবিস্‌ নে। কেবল ভাবি, এত কষ্টের উপরও তাঁদের আবার এ কি গলগ্রহ!”

“উঠ্‌লি যে?”

“আর বস্‌ব না, পথে লোক হবে, এই বেলা যাই, ভাই।”

“কাল আবার আস্‌বি?”

“কাল হয়ত হবে না। তুই থাক্‌তে থাক্‌তে আর একদিন আস্‌ব।”

“এক দিন আসবি! এমন হয়েছিস্‌, সতী? আমি কতক্ষণে তোর দেখা পাব, ভাব্‌ছি,—আর তুই স্বচ্ছন্দে বল্‌ছিস্‌, এক দিন আস্‌ব! বেশ ভাই, খুব যা হোক।”

হাসিয়া ভাইটিকে কোলে লইয়া সতী বাড়ী চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া দেখে, মহামারী ব্যাপার! “অত বড় চোদ্দ বছরের ধাড়ী মেয়েকে বড় লোকের বাড়ী যেতে দিতে লজ্জা করে না?” বলিয়া জ্যেঠাইমা লজ্জায় ঘৃণায় কণ্ঠের স্বর সপ্তমে চড়াইয়া দিয়াছেন। “আজ আসুক ঠাকুরপো, এর প্রতিকার করে তবে জলগ্রহণ করব।”

রাত্রি আটটার পর রামশঙ্কর বাটী আসিলেন। সাবিত্রী গিয়া তাঁহার পা ধুইবার জল দিল, হাত মুখ মুছিতে গামছা দিল, এবং শেষে একখানা পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল। জাহ্নবী অন্ন-ব্যঞ্জন বাড়িয়া দিলে, রামশঙ্কর ভোজনে বসিলেন। সতী এতক্ষণ কালীপদকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, এক্ষণে ত্যক্ত হইয়া তাহাকে শয্যার উপরে ফেলিয়া পিতার নিকট আসিয়া বসিল। কালীপদ উচ্চ চীৎকার করিল। সতী সাবিত্রীকে

বলিল, "তুই যা। আমি বাবাকে বাতাস করি!" সাবিত্রী তখন ভ্রাতাকে ক্রোড়ে করিয়া চাঁদ দেখাইতে দেখাইতে বাহু দোলাইতে দোলাইতে মৃদু স্বরে ছড়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। বালকও দিদির সঙ্গে আধ-আধ যোগ দিয়া ঢুলিতে লাগিল।

জাহ্নবী দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্বামীর ভোজন দেখিতে-ছিলেন। সহসা দীপালোক-বিচ্ছুরিত সতীর মুখে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। বাহিরের প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে দরিদ্রের জীর্ণ অঙ্গনে অর্দ্ধস্ফুট কমল-কলিকার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, অজ্ঞাতে তাঁহার একটা নিশ্বাস পড়িল। শুনিতে পাইয়া সতী একবার মার পানে চাহিল।

জ্যেঠাইমা এতক্ষণ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিলেন। যথাসময়ে তাঁহার সে সরব নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গম্ভীর গুরু পদক্ষেপে তিনি রন্ধন-গৃহের পীঁড়ায় উঠিলেন। সকলে প্রমাদ গণিল। ধীরে ধীরে গিয়া একখানা পীঁড়া পাতিয়া রামশঙ্করের সম্মুখে বসিলেন। রামশঙ্কর মুখ তুলিয়া একবার দেখিয়া পুনশ্চ আহারে মনঃসংযোগ করিলেন। তখন জ্যেঠাইমার ধৈর্য্য রক্ষা করা দায় হইল। কাংস্য কণ্ঠে সুর বাজিয়া উঠিল—

"বলি, গিলে ত যাচ্ছ! এদিকে চোদ্দ বছরের বার বছরের করে দুই মেয়ে যে গলায় আড় হয়ে লেগে রইল, তা কি টের পাচ্চ না? হুঁস-পবন কি নেই! চক্ষু কি গিয়েছে?"

রামশঙ্কর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তা কি করব! টাকা না হলে কি করে মেয়ে পার করব!"

"কেন, বাপ হতে পেরেছিলে? মেয়েদুটো মনমরা হয়ে বেড়ায়, বাছাদের মুখের দিকে চাইব্যার কেউ নেই গো।

এ কি কসাই বাপ-মা রে, বাবা! একবার ভাবে না, স্বচ্ছন্দে মুখে ভাত তোলে।"

জাহ্নবী মৃদু স্বরে বলিলেন, "দিদি, এখন ও সব কথা কেন তুলছ? ও কথা ত' আছেই এখন—" কণ্ঠ এইবার গগন ভেদ করিল,—

"ঐ জন্যেই এ সংসারে এক তিল থাকতে ইচ্ছে করে না! মরুক গে, আমার এত কি জ্বালা! বাপ-মা যখন নিশ্চিন্তি, তখন,—আমি কোন্ হিদের কুটুম বিদে,—আমি কেন মরি? আমার কেন এত ঝক্কি! আমার ত' জাত যাবে না, গালে চূণ-কালি পড়্‌বে না, শত্তুরও হাস্‌বে না!"

রামশঙ্কর অন্ন ছাড়িয়া উঠিতে গেলেন। সতী দুই হাতে পিতার পা চাপিয়া ধরিল, "বাবা, উঠো না, খাও বাবা।"

রামশঙ্কর সরোষে পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "হয়, তোরা মর্, নয় আমি—" বলিতে বলিতে তাঁহার হাঁপ আসিল। কাসিতে কাসিতে তিনি প্রায় শুইয়া পড়িলেন।

জাহ্নবী ত্রস্তে আসিয়া স্বামীকে ধরিলেন, বুক পিঠ ডলিয়া দিতে লাগিলেন, সাবিত্রী ছুটিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। সতী কাঠের মত বসিয়া রহিল।

প্রকৃতিস্থ হইয়া স্ত্রীর বহু অনুনয়ে রামশঙ্কর আহার শেষ করিলেন। জাহ্নবী স্বামীকে পান-তামাক দিতে গেলেন; সতী তখন ধীরে ধীরে গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। স্বামীকে সুস্থ করিয়া জাহ্নবী আসিয়া দেখিলেন, পাতের কাছে বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে সাবিত্রী পাখা দ্বারা বিড়াল তাড়াইতেছে। জাহ্নবী বলিলেন, "সতী কই?"

"দিদি শুতে গিয়েছে। তুমি ভাত দাও, আমি ডেকে আনি।"

সাবিত্রী গিয়া ডাকিল, "দিদি খেতে এস।" দিদি কোন উত্তর দিল না।

"দিদি, খেতে এস, মা বসে আছেন। ওঠ।" দিদি উঠিল না।

"ওঠ দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। বাবার কথায় কি রাগ কত্তে আছে—উনি কত কষ্টে অমন করে বলেন, তা ত' আমার চেয়ে তুমি বেশী বোঝ। ওঠ দিদি।"

সতী মুখের কাপড় খুলিয়া অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিল, "তুই যা। আমি আজ খাব না, ক্ষিদে নেই। তোরা খেগে যা।"

"আমি তা হলে আজ তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব। ওঠ দিদি, চল।"

"সাবিত্রী, লক্ষ্মী আমার! কথা শোন, তুমি গিয়ে খাও গে, আমার অসুখ করেছে।"

"সে কথা আমি শুনব না, অন্তত দুটীও তোমায় মুখে দিতে হবে।"

জাহ্নবী আসিয়া সতীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "তোরা শুদ্ধ যদি এমন অবুঝ হোস্, তা হলে আমার মরণই ভাল। খেতে চল্।"

তখন সকলে নীরবে গিয়া আহার-কার্য্য সমাধা করিল।

প্রভাতে রামশঙ্কর কয়েক ছিলিম তামাকু টানিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দ্যাখ, পাত্র খুঁজতে ত' আজ থেকেই আরম্ভ করলেম, কিন্তু সঙ্গতির মধ্যে এই বাড়ীখানি। যেমন তেমন পাত্রে দিতেও অন্ততঃ চার-পাঁচ শ টাকার দরকার। বাড়ীখানা বিক্রী

করা বা বন্ধক দেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। বাবুদের কাছে যদি বাড়ীখানা বন্ধক দিতে পারা যায়, ত তার চেষ্টা দেখি।"

জাহ্নবী বলিলেন, "আগে পাত্রের খোঁজ কর, তবে টাকার কথা।"

রামশঙ্কর বলিলেন, "তুমি তাই বলছ, আমি জানি, আগে টাকার খোঁজই দরকার। যেমন টাকা জোটাতে পারবে, তেমনি পাত্রও পাব। মেয়ের দায়ে ভিটেটুকুও এইবার যাবে।"

জাহ্নবী একবার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সতী ঘুমাইতেছে। এ কথা সে তবে শুনিতে পায় নাই! তিনি একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর 'সাবিত্রী' ব্রত উদ্‌যাপনে মহা ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছিল। বাড়ীতে বড় বড় জোল কাটিয়া রান্না-বান্না হইতেছে, ময়রারা সন্দেশ আনিয়া মহা সোরগোলের সহিত তাহা ওজন করিতেছে, গোয়ালারা বাঁকে বাঁকে দই-ক্ষীর আনিয়া দালান ভরিয়া ফেলিতেছে; প্রতিবাসীরা বড় বড় কাঠের কেঠো লইয়া ভীম পরাক্রমে ময়দা মাখিতেছে, সুদর্শন চক্রের ন্যায় ঝারণা-হাতাধারী ব্রাহ্মণ-কুলতিলক রাবণের ভোজের উপযুক্ত কড়ায় লুচি ভাজিতেছে—গন্ধে দিঙ্‌মণ্ডল পুলকিত। ভাঁড়, কটরা ও পাতে উঠান পরিপূর্ণ; নিস্তব্ধ বাটীখানি আজ পাড়া মাথায় করিয়া তুলিয়াছে। মাসিমাতা যখন যাহা ফরমাস করিতেছেন,

বিশ্বেশ্বরও নিতান্ত ব্যগ্রভাবে তাহার তত্ত্বাবধানে ঝুঁকিতেছে। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ব্রত-সমাপনান্তে ললাটে যজ্ঞ-চিহ্ন তিলক ধারণ করিয়া পট্টবস্ত্রে মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবীর ন্যায় কোথায় কিসের অভাব হইতেছে, তাহারই অনুসন্ধানে নিযুক্ত।

ক্রমে ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইল। অন্নপূর্ণার হস্তে তাম্বুল যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্নপূর্ণা স্নেহ-সজল চক্ষে বিশ্বেশ্বরকে সেইখানে প্রণত করাইয়া বলিলেন, "একেই সকলে আশীর্ব্বাদ করুন।"

বহু সমাদরের সহিত সধবাদিগকে ভোজন করানো হইল। সতী ও সাবিত্রীকে লইয়া জাহ্নবী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার মুগ্ধ দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ সতীর প্রতি নিপতিত হইতেছিল। তাম্বুল ও দক্ষিণা-বস্ত্রাদি গ্রহণান্তে সধবারা যখন বিদায় লইতে লাগিলেন, তখন অন্নপূর্ণা জাহ্নবীকে মৃদু স্বরে বলিলেন, "বৌ, একটু বসে আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।" জাহ্নবী অগত্যা বসিয়া রহিলেন।

গোলযোগ কিছু মিটাইয়া অন্নপূর্ণা আসিয়া একখানা আসন টানিয়া লইয়া নিকটে বসিলেন। বলিলেন, "বৌ, তোমার বড় মেয়েটির বয়স কত হল?" জাহ্নবী ম্লান মুখে বলিলেন, "তের চোদ্দ হল বই কি, দিদি।"

"বিয়ের কথা কোথাও হচ্চে-টচ্চে?"

"চেষ্টা দেখছেন, এখনও ত কোথাও কথা হয়নি।"

"এমন সুন্দর মেয়ে, লোকের এতদিনে লুফে নেবার কথা! তা এত দেরি হচ্চে কেন?" জাহ্নবী নীরবে রহিলেন। "আমি যদি বিশুর জন্যে এমন একটি বৌ পাই!" সতী নত মস্তকে বসিয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল।

জাহ্নবী ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বিশুর কনের অভাব কি, দিদি? এর চেয়েও কত ভাল ভাল মেয়ে পাবে।"

"তোমার মেয়েদুটির বড় গুণও শুনতে পাই। বড় হওয়া অবধি ওদের একদিনও আর দেখিনি। তা দেখ বৌ, আমি একেবারেই কথাটা ফেল্‌ছি! তোমার বড় মেয়েটিকে আমায় দাও।"

জাহ্নবী কিছুক্ষণ যেন বাক্‌শূন্যা হইয়া রহিলেন। অতি কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "দিদি, আমার মেয়ের কি সে ভাগ্যি হবে যে—"

"ও সব কথা রাখ। এমন মেয়ের ভাগ্যি হবে না ত' কার হবে! মা আমার সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী। বড় ঘেমেছ মা,—এস একটু বাতাস দি।"

অন্নপূর্ণা আঁচল দিয়া সতীকে বাতাস দিতে লাগিলেন এবং সতী দ্বিগুণ ঘামিতে লাগিল। সাবিত্রী তাহার কাছে একটু ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিল এবং হাসিভরা মুখে তাহার দিদির পানে এক একবার চাহিতে লাগিল। জাহ্নবী বলিলেন, "রাত হল দিদি, তবে উঠি।"

"আমার কথার উত্তর কি দিচ্চ? সতীকে আমায় দেবে না?"

"দিদি, সতী যদি তোমার পায়ে স্থান পায়, সে ত সতীর পরম ভাগ্যি। সতী তোমার হবে, এতে আর আমাদের কি কথা থাকতে পারে, দিদি? তবে বিশুর মত হবে ত?"

"সতীকেও যদি তার পছন্দ না হয় ত জানব, বিয়ে তার অদৃষ্টে নেই। কিন্তু শোন বৌ, এ কথা এখন বাইরে বেশী যেন না ছোটে। যে ছেলে, অন্যের মুখে শুনলে হয়ত কিছু

একটা করে বস্‌বে, আমি ক্রমে ক্রমে সব ঠিক কর্‌ব। কিন্তু কোন আশঙ্কা করো না। তোমার মেয়েকে পছন্দ হবে না, এমন ছেলে থাকতেই পারে না। যদি দুই একটু সবুর কর, আমি কথা দিয়ে রাখ্‌লুম।"

বাটী ফিরিয়া জাহ্নবী স্বামীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিলেন। ভট্টাচার্য্য শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। স্ফূর্ত্তিতে তিনি ধরাকে সরাজ্ঞান করিলেন। "তবে আর ভাবনা কিসের? বিশ্বেশ্বর যে ছেলে, ও কখনও টাকা চাইবে না, বাড়ীখানা বেঁচে যাবে। যা খরচ হবে, তা এখন কারও কাছে হাওলাত করে নিলেই হবে—কি বল? ক্রমশঃ শোধ দেওয়া যাবে" ইত্যাদি। জাহ্নবী একবার বলিলেন, "এখনি অত আনন্দ করো না। যদি ভবিতব্য থাকে ত হবে। কিছুই এখন বলা যায় না।"

"না, না, ওরা এক কথার মানুষ, আর বিশু অতি ভাল ছেলে! তা ছাড়া আমার মেয়ের রূপও নিতান্ত কম নয়। গ্রামের মধ্যে আর কার মেয়ে ও রকম আছে, বল দেখি?"

কন্যার রূপের গর্ব্বে তিনি সহসা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন। জাহ্নবী নীরবেই রহিলেন। এ অতর্কিত অসম্ভাবিত উচ্চ আশা তাঁহার অন্তরে কেমন যেন খাপ খাইতেছিল না।

দুই চারি দিন পরে অন্নপূর্ণা একদিন সতী ও সাবিত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সতীর যাইতে অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু না গেলেও নয়। অন্নপূর্ণা দুইজনকেই অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, নিকটে বসাইয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া শুভ্র পৈতা গাছটি মার্জ্জনা করিতে করিতে বিশ্বেশ্বর ভোজনার্থ মঙ্গলিমাতার

নিকট আসিল। তাহাদের দেখিয়া একবার পিছাইয়া, আবার কি ভাবিয়া একবারে মাসিমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "মেয়ে দুটি কাদের, মাসিমা?"

মাসিমা সকৌতুকে বলিলেন, "বল দেখি, কাদের?" বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সতী ত' লজ্জায় অধোমুখী। সাবিত্রীরও একটু লজ্জা করিতেছিল, কেন না, মাসিমার ইচ্ছা সে জানিত। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া বলিল, "এটি ত সতী, না মাসিমা? আর উটি?"

"সতীর বোন, সাবিত্রী। দেখ্ দেখি বিশু, কেমন মেয়েদুটি?"

"বেশ! তুমি বুঝি নিমন্ত্রণ করে এনেছ, মাসিমা? আজ কি ব্রত?"

"ব্রত না হলে বুঝি আপনার লোককে খাওয়াতে নেই? এদের সঙ্গে ততক্ষণ তুই গল্প কর্, আমি ভাত বাড়িগে।"

মাসিমা চলিয়া গেলেন। বিশ্বেশ্বর একটা জানালার উপর উপবেশন করিয়া বলিল, "সতী, তোমার ছোট ভাইটির নাম কি? তাকে আননি কেন?"

সতী লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল, তাহার সমগ্র মুখখানি রক্ত গোলাপের মত টুক্‌টুকে হইয়া উঠিল, কানের কাছটা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল, কপাল বহিয়া ঘর্ম্ম ঝরিয়া পড়িতেছিল।

দিদির বিপদ দেখিয়া সাবিত্রী মৃদু স্বরে বলিল, "তার নাম কালীপদ। সে ঘুমিয়েছে।"

"তোমার নাম বুঝি সাবিত্রী?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাকে আমি খুব ছোট বেলায় দেখেছি, তাতেই চিন্‌তে পারিনি। সতীকে আমি অনেক বার দেখেছি। সতী! তুমি

পড়তে পার? কি কি বই পড়েছ? রামায়ণ মহাভারত পড়েছ?"

সতী তথাপি উত্তর দিতে পারিল না। বিশ্বেশ্বর তাহার এতখানি লজ্জা দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সাবিত্রী সতীর হইয়া উত্তর দিল, "দিদি রামায়ণ মহাভারত পড়েছে।"

"তুমিও পড়েছ ত?" সাবিত্রী মস্তক ঈষৎ নত করিল।

আহারাদির পর তাহারা বাড়ী চলিয়া গেলে মাসিমা বলিলেন, "দুটি মেয়ের মধ্যে কোনটি বেশী সুন্দর, বল্ দেখি?"

"বেশী সুন্দর?" বিশ্বেশ্বর একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "দুটিই ভাল। কে বেশী, কে কম, অত আমি দেখিনি। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন, মাসিমা?"

"তোর একটু জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে কি না, পরখ করতে। সতী মেয়েটির উপর হতে চোখ যেন আর নামাতে ইচ্ছে করে না।"

"সত্যি নাকি? তা হবে। মেয়েদুটি খুব ভাল বটে। ওদের সংসারের আর কোন কষ্ট নেই,—নয় মাসিমা?"

"না, কষ্ট কিসের! তবে মেয়েটি বড় হওয়ায় ভারী ভাবনায় পড়ে গিয়েছে।"

"কেন? ভাবনা কিসের?"

"বিয়ে না দিতে পারলে ভাবনা নয়? টাকা নেই, ভাল পাত্র পাচ্চে না, অমন সুন্দর মেয়ে!" বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তা তুমি টাকা ধার দাও না কেন, মাসিমা? আহা, বেচারীরা!"

মাসিমা রাগ করিয়া বলিলেন, "আমার ত টাকা ধরছে না, ভারী উপদেশ দিতে এলো! টাকা হলেই ভাল ছেলে মেলে

কি না! অমন মেয়ের যুগ্যি ছেলে অমনি সহজে মিলতে পারে?"

"তা সত্যি মাসিমা! আমি তা হলে একটু খোঁজে থাক্‌ব, কেমন? যদি ভাল ছেলে পাই,—তুমি কিন্তু টাকা দেবে ত!"

মাসিমার আর সহ্য হইল না। তিনি বলিলেন, "যা, তোর সঙ্গে আর আমি বক্‌তে পারি না। এমনও ছেলে!" ছেলে মাসিমার এ রাগের অর্থ না বুঝিয়া অম্লান প্রফুল্ল মুখে আপনার পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিল।

মাসাবধি কাটিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর এক দিন কার্য্যগতিকে ভট্টাচার্য্য বাড়ীর সম্মুখ দিয়া আসিতেছিল। সে দেখিল, শুভ্র সুন্দর নগ্নকায় কালীপদ একটা গোবৎস ধরিয়া খেলা করিতে করিতে এতই উন্মত্ত যে গাভী তাহাকে মারিতে আসিতেছে, সেদিকে তাহার হুঁসই নাই। বিশ্বেশ্বর এক লম্ফে গিয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গাভী বৎসকে মুক্ত দেখিয়া বালককে ত্যাগ করিয়া বৎসের প্রতি ধাবমান হইল। বিশ্বেশ্বর বালককে আদর করিয়া অভয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি খোকা?"

খোকা গম্ভীরমুখে বলিল, "খোকা নয়, আমি কালীপদ।"

"কালীপদ! এখনি যে তোমায় গরুতে গুঁতুত।"

"ইস্। গরুকে আমি এক লাঠি বসিয়ে দিতুম।"

তখনও কিন্তু বালক কাঁপিতেছিল। বিশ্বেশ্বর তাহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট হইতে কে ডাকিল, "কালী!" বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া দেখে, সতী।

সতী থমকিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বেশ্বর নিকটে আসিয়া বলিল,

"এখনি একে গরুতে মারত। ছেলেদের একটু সাবধানে রেখো।"

সতী কথা কহিল না। বিশ্বেশ্বর তাহার ক্রোড়ে বালককে দিতে গেলে সতী একটু পিছাইয়া গেল। পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে, তাই সে বিব্রত।

কালীকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল, "ওকে কোলে নাও, এখনও ভয়ে কাঁপ্‌ছে।" সতী ভ্রাতাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। লজ্জায় সে-ও কাঁপিতেছিল।

বিশ্বেশ্বর বলিল, "তোমরা আর মাসিমার কাছে যাও না যে!" কোন উত্তর না দিয়া সতী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, বিশ্বেশ্বর একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এরূপ স্থলে একটা কথা কওয়া উচিত, নহিলে নিতান্তই অকৃতজ্ঞের মত দেখায়। লজ্জার মাত্রাটা এত বেশী হওয়া মোটেই শোভন নহে।

দুই মাস অতিবাহিত হইল। তখন মাসিমা দেখিলেন, তাঁহার মূর্খ ছেলেটিকে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। নহিলে সে বুঝিবে না, বা বুঝিতেও চাহিবে না। একদিন অসময়ে পুত্রকে ডাকিয়া বিনাড়ম্বরে তিনি বলিলেন, "তোর বিয়ের আমি সব স্থির করেছি। আস্‌ছে মাসে সতীর সঙ্গে তোর বিয়ে।"

বিশ্বেশ্বর সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে সে বলিল, "সে কি মাসিমা! সতীরা যে আমাদের সম্পর্কে কি হয়।"

"কি আবার হবে? স্বজাতি, একটু দূর সম্পর্কের কুটুম্ব, তাতে বিয়ে আটকায় না।"

"আটকায় বৈকি। আজ্ঞে ছি ছি, ওদের ভাই হব্‌লি আমায়

দাদা বলে ডাকে। ওরাও হয়ত কত দিন বিশুদাদা বলে ডেকেছে। ছি ছি মাসিমা।"

"তবে তুই কি বিয়ে করবিনে? বিয়ে করলেই বা অমন মেয়ে আর কোথায় পাবি?"

"তা নিশ্চয় পাওয়া যাবে, মাসিমা। আর যদি তাই হয়, তখন তোমাকে একটা কুৎসিত মেয়ে না এনে দিলেই ত হল! এখন তুমি আমায় বিয়ের কথা বলো না, মাসিমা।"

"আর কবে বিয়ে কর্‌বি, শুনি! চব্বিশ বছর পার হতে চল্‌ল, নিতান্ত কি ছেলেমানুষ আছিস্ যে, এখনও ছেলেমী করবি! আমি এই শেষ বলছি, শোন্, আমি কথা দিয়েছি, দু মাস তারা আশা করে বসে আছে, এখন যদি আমায় এ রকম অপমান করিস্ ত আমি আর তোর সংসারে থাকব না।"

বিশ্বেশ্বর কাতর হইয়া পড়িল। "মাসিমা, এতদিন আমায় মাপ করেছ যদি, ত অন্ততঃ আরও বছর খানেক মাপ কর। তোমার পায়ে পড়ি, মাসিমা! আমি মনটা বেশ করে দুরস্ত করে নিই।"

"আচ্ছা, মন কি দুরস্ত করবি, বল্ ত? বিয়ে কি কেউ করে না?"

"তা করবে না, কেন? কিন্তু আমি ত আর এর পূর্ব্বে কথনো বিয়ে করিনি। কাজেই ভয় পেয়ে যাচ্চি, মাসিমা। আমি মনকে অনেক দিন থেকে সাহস দিয়ে রেখেছি, তাকে আমি স্বাধীন রাখব। কিন্তু তুমি এমন করে বল্‌লে সে আশা আমায় বিসর্জ্জন দিতে হবে। তবে একটু সময় দাও। অমন করে বেঁধে মেরো না, মাসিমা।"

মাসিমা হতাশ চিত্তে বলিলেন, "তারা এক বছর কিছু মেয়ে রাখতে পারবে না। আমি তাদের কাছে আর মুখ দেখাব না, বিশু। আমায় তা হলে মজুতপুর ছাড়তে হবে।"

"তুমি ছাড়লে আমিও ছাড়্‌ব, মাসিমা। ত্যাখ, আমার চেয়ে ঢের ভাল জামাই আমি তাদের করে দেব। তাতে যত টাকা লাগে, দেওয়া যাবে। তা হলে ত তারা কিছু মনে করবে না।"

"যা জানিস্, কর্, বিশু! কিন্তু এমন মেয়ে তুই পায়ে ঠেল্‌লি, শেষ তোকে পস্তাতে হবে।"

মাসিমা নিরাশ চিত্তে থামিলেন! মনে তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিলেন। বিশ্বেশ্বর তাহা বুঝিলেও কিছুতেই মন ফিরাইতে পারিল না। বিবাহ না করাই যেন তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল, এখন নিজেকে কিছুতেই বিবাহের বেশে সে সাজাইতে পারিল না। সতীকে কি মতলবে মাসিমা আনিতেন, এখন সে তাহা বুঝিতে পারিল। না বুঝিয়া নির্লজ্জের মত ব্যবহার করায় সতীর সেই আরক্ত লজ্জার স্মৃতি আজ তাহার মনে পড়িয়া গেল। সবেগে সে বলিয়া উঠিল, "ছি, ছি! না, সে কোনমতেই হয় না।"

পরদিন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নিকট গিয়া বহু আত্মীয়তা জ্ঞাপনান্তে বিশ্বেশ্বর বলিল, সে একটি উত্তম পাত্র স্থির করিয়াছে এবং ভগিনীর বিবাহে ভ্রাতার যেরূপ অধিকার, সেই অধিকারে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াও সে কৃতার্থ হইতে চাহে।

রামশঙ্কর ক্রোধে অন্ধকার দেখিলেন, তাঁহার আত্মসম্মানে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তাঁহার কন্যা কি এতই হেয়? গর্ব্বিত বচনে তিনি বলিলেন, "বাপু, তোমার কাছে অত্যন্ত

ঋণী আছি, আর বোঝা বাড়াব না। আমার কন্যার ভার আমিই বহন করতে পারব, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

বিশ্বেশ্বর বহু সাধ্য-সাধনা করিল, তথাপি ব্রাহ্মণ অটল। অগত্যা সে বিষণ্ণ বদনে ফিরিয়া মাসিমাতাকে সমস্ত নিবেদন করিল। তিনি দুঃখে লজ্জায় অভিমানে বলিলেন, "আমি কিছুদিন গিয়ে কাশী বাস করব, এখন এদের মুখ দেখাতে পারব না। তুমি তার ব্যবস্থা কর।"

বিশ্বেশ্বর নীরবে সমস্ত উদ্যোগ করিল। মাসিমা কাশী যাত্রা করিলেন। কথা ছিল, বিশ্বেশ্বর পথ হইতে ফিরিবে, কিন্তু সে-ও ট্রেনে উঠিয়া বসিল। মাসী বলিলেন, "তুমি কোথা যাবে?"

"তুমি যেখানে। আমায় আবার মাতৃ-হারা করবে, মাসিমা?" মাসী আর কিছু না বলিয়া তাহার মস্তক ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর যেমন একটা তীব্র নিশ্চিন্ত ভাব আসে, মৃত্যুর পর যেমন যন্ত্রণাকাতর মুখে শান্তির পাণ্ডু বর্ণ জাগিয়া উঠে, সতীর বিবাহ দিয়া রামশঙ্করও সেইরূপ একটা তীব্র মুক্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। নবগ্রামবাসী স্বনামখ্যাত তিনকড়ি লাহিড়ী নগদ তিন শত টাকা মাত্র পণ লইয়া তিলকাঞ্চনে শুদ্ধ করিয়া সতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। বলা ঠিক হইল না—পত্নী আখ্যা দিলেন। কেন না, বিবাহের পর সতীকে স্বামীর গৃহে যাইতে হয় নাই। ব্রাহ্মণ শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকারের পরাকাষ্ঠা

প্রদর্শন এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের জাতিকুল-রক্ষার্থ এবম্বিধ কার্য্য করিয়াছেন। যখনই তাঁহার সংসারে অভাবের মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে, তখনি কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তির আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ পূর্ব্বক নিজের অভাবও তিনি পূর্ণ করেন। সম্প্রতি তাঁহার আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, এভাবে বেশী দিন বোধ হয় আর তাঁহার ব্যবসায়-কার্য্য চলিবে না, সম্প্রতি চিত্রগুপ্তও হিসাব নিকাশ দুরস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাই এই কয়টা দিনের মধ্যে যতটুকু পরোপকার তবু করিয়া লওয়া যায়।

কিন্তু তাঁহার কথা থাক। রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এখন নিশ্চিন্ত। কন্যাদায়ে-জাতিনাশের ভয়ে নিশ্চিন্ত, এবং সঙ্গতির মধ্যে বাটীখানি কুঠিয়ালদিগের নিকট সাড়ে তিন শত টাকায় বন্ধক দিয়া নিশ্চিন্ত। কেন না, তিনি জানেন যে, এ জন্মে আর তাঁহার সে বাটী উদ্ধার করিবার সাধ্য হইবে না। এখন সম্বল শুধু দশটি টাকা, এবং তাঁহার অকালবৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্ন শরীর। সে দিকেও তিনি পাড়ি জমাইয়া আনিতেছেন, ইহাও বুঝিয়াছিলেন। যে কয়টা দিন থাকিতে হইতেছে, সে কয়টা দিনও যেন নিতান্ত অসহ্য ঠেকিতেছে! সতী সম্মুখে আসিলে গালি দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন, ক্বচিৎ কোন দিন পুত্র বাটী আসিলে গালি দিয়া, অভিসম্পাত করিয়া তাহাকেও বাটী হইতে চলিয়া যাইতে বলেন, কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার করেন, সাবিত্রীকে দেখিলে মুখ ঢাকেন, জাহ্নবী ও ভ্রাতৃজায়ার সহিত বাক্যালাপও করেন না। পুত্র-কন্যারা কখন কাঁদে, কখনও রাগ করে, জ্যেঠাইমা চীৎকারে বাড়ী মাথায় করেন, জাহ্নবী শুধু নির্ব্বাকভাবে গোপনে অশ্রু মুছেন। এক এক দিন তাঁহার বুকের বেদনা ও হাঁপানি এমন বাড়িয়া উঠে যে, সকলে

দিন-রাত্রি সশঙ্ক চিত্তে কাটিয়া যায়। সে সময় যাহারা শুশ্রূষা করে, রামশঙ্কর তাহাদেরও কটূক্তি করেন। নীরবে তাহারা সে সব সহ্য করে।

এই ভাবে সতীর বিবাহের পর ছয় মাস কাটিয়া গেল। ক্রমশই তাঁহার শরীর নির্জীব হইয়া পড়িতেছিল, তথাপি কুঠীর কাজে কোনদিন তিনি কামাই দিলেন না।

সেদিন বৈকাল হইতেই ঘনঘটা করিয়া আকাশে মেঘ জমিতেছিল। সতী ও সাবিত্রী ত্বরান্বিত হইয়া সংসারের কার্য্য সারিয়া লইতেছিল, জাহ্নবী হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া পুনঃ পুনঃ উন্মনাভাবে দ্বারের প্রতি চাহিতেছিলেন। এই দুর্য্যোগ উপস্থিত হইতেছে, স্বামী আজ বাড়ী আসিবেন! জ্যেঠাইমা হরিনামের মালা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি একবার পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। কেন না, যেরূপ মেঘ জমিতেছে, তাহাতে কন্যাদের নিন্দা ও সমালোচনা করিবার জন্য হয় ত আজ সুযোগ না মিলিতেও পারে! প্রাতঃকাল পর্য্যন্তইবা অপেক্ষা করিতে হয়!

সহসা হু-হু শব্দে ঝড় আসিল। চালের খড় উড়িয়া দিক্‌দিগন্তরে ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। জীর্ণ গৃহ যেন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। প্রাঙ্গন ঘন-কজ্জল মেঘছায়ায় অন্ধকার। কলাগাছগুলা মাটিতে নুইয়া শুইয়া পড়িতে লাগিল। উঠানের গাছ হইতে দুম-দাম করিয়া আম পড়িতেছে দেখিয়া জ্যোঠাইমা ধামা মাথায় দিয়া আম কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পবনকে যথেষ্ট গালি দিতে লাগিলেন। কালীপদ আম কুড়াইবার জন্য মহাধূম বাধাইলে সতী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহের মধ্যে গিয়া ভুলাইতে লাগিল, জ্যোঠাইমা তাহাকেও কথা শুনাইতেছিলেন

কিন্তু তাঁহার তীব্র স্বর সে সঘন বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল।

দুয়ারে হেলান দিয়া জাহ্নবী দাঁড়াইয়া ছিলেন। ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি মেঘান্ধকার ভেদ করিয়া বহুদূরে ধাবিত হইয়াছে, সাবিত্রীর ভীত ব্যাকুল নেত্র মাতার মুখের পানে নিবদ্ধ,—তাহার রুক্ষ চুলগুলা বাতাসে উড়িতেছে, শীর্ণ শুভ্র মুখে বিপন্নের ভয়ার্ত্ত ভাব। একবার অস্ফুট স্বরে সে কেবল ডাকিল, "'মা—"

মা উত্তর দিলেন না। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। দৌড়িয়া আসিতে জ্যেঠাইমা আবার ধামা লইয়া একটা আছাড় খাইলেন। সাবিত্রী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল, জ্যেঠাইমা শোকে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। জাহ্নবী তখনও অচল প্রতিমার মত দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রকৃতির তুমুল আন্দোলন। নীচের দ্রব্য উপরে তুলিয়া উপরের বস্তু নীচে ফেলিয়া যেন দুর্দান্ত বালকের বিরাট জয়োল্লাস। সেই শব্দের মধ্যেও জাহ্নবী যেন বহির্দ্বারে কি-একটা দ্রব্য-পতনের ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি রোয়াক হইতে নামিয়া দৌড়িলেন, সঙ্গে সতী ও সাবিত্রী। মুহুর্মুহু তাহাদের পদস্খলন হইতে লাগিল। তথাপি তাহারা প্রাণপণে বহির্দ্বার অভিমুখে ছুটিল।

দ্বারের বাহিরে রামশঙ্কর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। জাহ্নবী গিয়া ধরিয়া তাঁহাকে তুলিলেন। সতী ও সাবিত্রী আর্ত্ত স্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "বাবা—"

"চুপ কর্—চুপ্ কর্—ধর্, ধর্, আমি সাম্লাতে পাচ্চি না।"

জাহ্নবী তখন বেতস পত্রের মত কাঁপিতেছিলেন। প্রকৃতির

ন্যায় তাঁহারও চোখের সম্মুখে দারুণ অন্ধকার নিমেষে জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। সামলাইয়া অতি কষ্টে তিনজনে সে সংজ্ঞাশূন্য দেহ ধরিয়া গৃহে তুলিলেন। জ্যেঠাইমা তাঁহার বেদনাহত পা লইয়া বিকট গর্জ্জন করিতেছিলেন, এখন থামিয়া গেলেন। সতী ডাকিয়া বলিল, "জ্যেঠাইমা, একটু আগুন কর—শীগগির।" খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে জ্যেঠাইমা গিয়া ঘুঁটে জ্বালিয়া কড়ায় আগুন করিতে লাগিলেন।

সিক্ত বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে মুছাইয়া রামশঙ্করকে শয্যায় শোয়ান হইল। তখনও তিনি হতজ্ঞান। সতী একটা ভাঙা সিন্দুক হইতে একটা ছেঁড়া ফ্লানেলের জামা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা পিতার হস্তপদ ঘর্ষণ করিতে লাগিল। এদিকে অগ্নিও প্রস্তুত হইল, হস্ত, ও বস্ত্রের পুঁটুলি গরম করিয়া সেঁক দেওয়া হইতে লাগিল। জাহ্নবী ও সতী নীরব, নির্ব্বাক। সাবিত্রী একবার রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা।"

কালীপদ স্তম্ভিতভাবে এক ধারে দাঁড়াইয়াছিল, সাবিত্রীর স্বরে সাহস পাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল।

সতী বলিল, "কালী, চুপ কর্, কাঁদিসনে—ভয় কি? বাবা ভাল আছে।" মাকে বলিল, "মা একটু দুধ গরম করে দাও।"

জাহ্নবী ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "তুই আন্। আমি উঠতে পাচ্চি না।"

সতী দুধ গরম করিল। ঝিনুকে করিয়া পিতার মুখে অল্প অল্প করিয়া সেই দুধ দিতে লাগিল। ক্রমে তিনি একটু নড়িলেন, দুধ খাইলেন, জোরে কয়েকটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সকলে একটু

নড়িয়া চড়িয়া বসিল, এতক্ষণ যেন অঙ্গ-সঞ্চালনেও কাহারো সাহস হইতেছিল না। ক্রমে রামশঙ্কর চক্ষু মেলিলেন, একটু যেন পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন। সতী ডাকিল, "বাবা—"

রামশঙ্কর কন্যার দিকে চাহিলেন, ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "কে?"

"বাবা, আমি সতী।"

মুমূর্ষু রামশঙ্কর সহসা যেন কি এক শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সবলে কন্যাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "সরে যা, দূর হয়ে যা—সর্ব্বনাশি, আমার আর কি করবি! খাবি? দূর হ!"

সতী সরিয়া বসিল। জাহ্নবী মুখ নত করিয়া নীরবে স্বামীর অঙ্গে তাপ দিতে লাগিলেন, সাবিত্রী চোখ নীচু করিল। জ্যেঠাইমা অস্ফুট গুঞ্জনে বলিলেন, "মর্ মিন্‌সে—স্বভাব যায় না মলে।"

জাহ্নবী বলিলেন, "এখন একটু ভাল বোধ হচ্চে কি! আছ কেমন?"

"আর কেমন আছি, থাকাথাকির আজ শেষ। আর দেখছ কি, জাহ্নবী, আমি বাঁচছি না।"

জাহ্নবী নীরবে রহিলেন। সাবিত্রী কাঁদিয়া উঠিল, "অমন কথা বলো না, বাবা!"

রামশঙ্কর তীব্র দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, "কেন? কিসের কষ্ট? আমি কখনও তোমাদের বাপের উপযুক্ত কাজ করেছি যে, তাই তোমাদের কষ্ট হবে? চিরদিন আধপেটা খেয়ে, খেটে, বকুনি খেয়ে মানুষ হচ্চ, আমি অবর্ত্তমানেও তাই হবে। কিসের কষ্ট? আমি ... কুলে তোমাকেও হয়ত গঙ্গাযাত্রী

ধরে বিয়ে দেব! আমি তোমাদের বাপ? না।" উত্তেজনার আধিক্যে রামশঙ্কর আবার প্রায় অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণপরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সহসা বলিলেন, "হরে এসেছে, বুঝি? দাও, দূর করে দাও—ওটাকে দূর করে দাও।"

সাবিত্রী বলিল, "কই, দাদা ত' আসেনি।"

"আসেনি? যাক্, ওটার হাতে আমি জলপিণ্ডও নেব না—কালী দেবে—ওটা অধঃপাতে যাক্।"

জাহ্নবী স্বামীর মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর দেখি, কষ্ট কম্‌বে। ঘুমোও।"

"কষ্ট আর কমেছে! একেবারে কম্‌বে, জাহ্নবী।"

সতী দ্বারের নিকট সরিয়া বসিয়াছিল। দ্বার ঈষৎ খোলা ছিল। তখনো অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে,—বাহিরে ভেকের অবিশ্রাম কলরব, আর সূচীভেদ্য অন্ধকার। আর্দ্র বায়ু এক একবার দ্বারের নিকট আসিয়া হু হু করিয়া হুঙ্কার দিতেছে। সতী একদৃষ্টে সেই অন্ধকারের পানে চাহিয়াছিল। বোধ হয়, সে ভাবিতেছিল, এই অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিলে কখনো কি ঊষার আলোক চোখে পড়ে না।

রামশঙ্কর একবার একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন, আবার তখনই জাগিয়া ডাকিলেন, "জাহ্নবী—"

জাহ্নবী উত্তর দিলেন, "কেন?"

"কালী কই?"

"ওই যে তোমার পাশে শুয়ে ঘুমুচ্চে।"

অতি কষ্টে রামশঙ্কর তাহার মস্তকে হস্ত রাখিলেন। জাহ্নবী বলিলেন, "ও কি কচ্চ?"

"আশীর্ব্বাদ কচ্চি। সাবিত্রী ঘুমুচ্চে?"

"বাবা—" বলিয়া সাবিত্রী পিতার সম্মুখে আসিল। পিতা বলিলেন, "এস, আশীর্ব্বাদ করি।"

"বাবা, অমন কথা বলো না, বাবা, বড় কষ্ট হয়।" সাবিত্রী কাঁদিয়া উঠিল।

জাহ্নবী বলিলেন, "সাবিত্রী চুপ কর্, কাঁদিস্‌নে। ওতে আরও কষ্ট পাবেন।"

"না, না, কষ্ট কিসের—কষ্ট কিসের মা? আশীর্ব্বাদ কচ্চি।—হরে—হরেটা নেই, না? তা তাকেও আশীর্ব্বাদ কচ্চি—হাজার হোক্, ছেলে ত।"

"বাবা, তবে দিদিকে আশীর্ব্বাদ কচ্চেন না, কেন? দিদিকে করুন।"

একটু একটু করিয়া থামিয়া থামিয়া রামশঙ্কর বলিলেন, "তোমার দিদিকে? সতীকে? আশীর্ব্বাদ? না, উপহাস! বাপ,—বাপ হয়ে মেয়েকে কি মরবার সময় উপহাস করে যাব?"

জাহ্নবী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি বকেছ, দেখ, তোমার সতী দোরের কাছে বসে আছে—একবার তাকে ডাক।"

রামশঙ্কর সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "সতী, মা, এস।"

সতী যথাসম্ভব মুখ নীচু করিয়া বাম হস্তে চক্ষু ঢাকিয়া পিতার পদতলে আসিয়া বসিল। পিতা বলিলেন, "ওখানে না, কাছে এস—তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে। অনেক বকেছি।"

সতী মুখ ফিরাইয়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। রামশঙ্কর তাহার দিকে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে

আশীর্ব্বাদ ? আশীর্ব্বাদের ত কোন দরকার নেই ! থাকৃত,—যদি—যদি তোমায় বিশ্বেশ্বর—নাঃ, সে কথায়—সে কথায় কাজ নেই। কি করব ? আশীর্ব্বাদ ? শোন মা, বাপের পাপেও ছেলে মেয়ে কষ্ট পায়। তাই তোমরা কষ্ট পাচ্চ—পাবেও। কি করব, বল ? হাত নেই। জ্ঞানতঃ ত' এমন পাপ কিছু করিনি—তবে—তবে পূর্ব্ব জন্মের ফল। তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার মূলোচ্ছেদ ত' আমি করে দিয়েছি,—আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করব মা ? তবে—তবে জেনো—অনেক কষ্টে, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে, আমি তোমাকে—সন্তানকে হত্যা করেছি,—আমার হাত ছিল না।"

সতী কাঠের মত বসিয়া রহিল। জাহ্নবী বলিলেন, "এখন ও সব কথা থাক্। একটু ঘুমোও।"

"ঘুম ? আর একটু পরেই বেশ ঘুমোবো, গভীর নিদ্রা, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে ! আঃ, সে কি তৃপ্তি ! তার আগে দুটো কথা কই। সতী, কোথা মা ? উঠে গেলে ? না, এই যে, শোন। কি বলব ? মনে আসছে না। হ্যাঁ—তোমায় আশীর্ব্বাদ ? কি বলে আশীর্ব্বাদ করি বল দেখি, মা ? আমি ত' যাচ্চি, তোমায়—"

স্থির অবিকৃত কণ্ঠে সতী বলিল, "আপনি যাচ্চেন ? না, বাবা। আপনার ভাল করে সেবা করা আমার ঘটে উঠল না, আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার কাছে গিয়ে যেন আপনার সেবা করতে পারি।"

"আমার কাছে গিয়ে ? হ্যাঁ ! বড় আরামের জায়গা সে, বটে ! বিশ্রাম। বিশ্রাম ! যাবে সতী ? বড় কি পরিশ্রান্ত হয়েছ, মা ! এই

অল্প বয়সে, এই নতুন জীবনে এত শ্রান্ত হয়েছ? তবে এস, এস! আমার কোলে এস—এস মা, তোমায় কোলে নিয়ে, সেই ছোটটির মত,—এস মা, আমরা যাই!"

জাহ্নবী স্বামীকে শান্ত করিবার জন্য মস্তকে মুখে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। রামশঙ্কর বলিলেন, "দোষী? হাঁ! আমি দোষী বই কি! কি দোষ, জান মা? অশক্ত হয়েও কেন আমি সংসার করেছি, বিয়ে করেছি, সন্তান-সন্ততি হয়েছে! দোষী বই কি! বিয়ে আমি করেছি বটে, কিন্তু সে দোষে দোষী, আমার মা-বাপ। তাঁদের পাপে আমি কষ্ট পেলাম, আমার পাপে তোমরা কষ্ট পেলে—দোষী বই কি মা—তবে হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ? করব—আর একটু পরে,—একটু পরে—ভেবে দেখি, —তার পরে।" শ্রান্ত রোগী ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সাবিত্রী মাতার পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সতীরও মধ্যে মধ্যে ঢুল আসিতেছিল, তথাপি সে দেওয়ালের গায় হেলান দিয়া বসিয়াছিল। জাহ্নবী শুধু অপলক নেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। সহসা সতীর গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তিনি ডাকিলেন, "সতী—"

সতী চক্ষু মেলিল, বলিল, "কি মা?"

"ত্যাখ, গলায় কি একটা শব্দ হচ্চে, মুখটা এক একবার যেন কি রকম কচ্চেন—কি করব সতি?"

সতী কিছুক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, "মা, ডাক্তার ডাক্‌লে হয় না?"

"এখনও রাত রয়েছে—ঠিক যাবে?"

মাতা ও ভগ্নীর সতর্কতাসত্ত্বেও সাবিত্রী জাগিয়া উঠিয়াছিল। দাঁড়াইয়া সে বলিল, "আমি যাই।"

"তুই ছেলেমানুষ। একলা কি করে যাবি?"

"আমি চল্লুম—মা, তুমি একটু আগুন কর। আমি এখনি আসব—হারাণ ডাক্তারের বাড়ীও ত' বেশী দূর নয়।"

সতী চলিয়া গেল। জাহ্নবী আগুন করিয়া স্বামীর হাত-পা সেঁকিতে লাগিলেন। দৃষ্টি দ্বারপানেই আবদ্ধ রহিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার ও সতী আসিল, সকলে একটু আশ্বস্ত হইল। ডাক্তার অবস্থা দেখিয়া কিছু বলিল না, ভিজিটও লইল না, শুধু দুই পুরিয়া ঔষধ দিয়া চলিয়া গেল।

রামশঙ্করের সে প্রনষ্ট জ্ঞান আর ফিরিল না। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। তখন জ্যেঠাইমা উচ্চ রোদনে দুই-চারি জন লোক জুটাইয়া মুমূর্ষুকে তুলসীতলায় আনিলেন। জাহ্নবী দুই হস্তে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইয়া নীরবে পড়িয়া রহিলেন, লজ্জাবতী উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে পারিলেন না। সাবিত্রী "বাবা" "বাবা" করিয়া গলা ভাঙিয়া ফেলিল, কালীও তদ্রূপ। সতী নীরবে গঙ্গাজল লইয়া পিতার মুখে দিতে লাগিল। উথলিত অশ্রুর রাশিতে তাহার চক্ষু ছাপিয়া গিয়াছিল। জ্যেঠাইমা "গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন অন্য দিনের মতই চারিদিকে উষার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যেমন সর্ব্বস্থানে হইতেছে, সংসারের যাহা নিত্যকার—নিত্যকার কেন, প্রত্যেক নিমেষের,—ঘটনা, ভট্টাচার্য্য পরিবারের হাহাকার, আর্ত্ত রোদনের মধ্যেও সেই সকল ঘটনা লইয়া দিন দিব্য কাটিয়া গেল। পাড়ার পরোপকারী যুবকবৃন্দ রামশঙ্করের শেষ কার্য্যে যথেষ্টই সহায়তা করিল। জাহ্নবীর দ্বারাই মুখাগ্নি করানো হইল, কেন না সুপুত্র হরি তখন গ্রামে ছিল না, চাঁদপুরের বাবুদের সঙ্গে কলিকাতায় গিয়াছে। অগ্নিক্রিয়ার সময় জাহ্নবী সহসা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেজন্য সকলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া যথোচিত বেশ পরিবর্ত্তন করাইয়া বাটীতে কন্যাদের নিকট রাখিয়া গিয়া যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিল।

শোকাচ্ছন্ন দীর্ঘ দিনগুলা কাটিয়া চলিল, তাহারা ত কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। মানুষ কেবল জোর করিয়া তাহার মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লয় মাত্র। নির্ব্বাক নিস্পন্দা মাতার পানে চাহিয়া চাহিয়াই সতী ও সাবিত্রীর দিন কাটিয়া যায়, কালীপদ মধ্যে মধ্যে কাঁদে, তাহারা সান্ত্বনা দেয়। শ্রাদ্ধের আর দুই দিন মাত্র দেরী। কুঠিয়ালরা ধর্ম্ম-জ্ঞানে রামশঙ্করের প্রাপ্য মাহিনার দশটি টাকার মধ্যে দিন হিসাবে পাঁচ আনা এক পয়সা দেড় কড়া এক ক্রান্তি কাটিয়া লইয়া বাকী নয় টাকা পোনে এগার আনা তিন কড়া দুই ক্রান্তি পাঠাইয়া দিয়াছে। সতী তাহা রাখিয়া দিয়াছে, কেন না, শ্রাদ্ধে ইহার প্রয়োজন আছে। খাইতে না পাইলেও

পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করা চাই। প্রত্যহই সকলে আশা-পথ চাহিয়া থাকে, বুঝি ভ্রাতা আসিবে, কিন্তু ভ্রাতা আসিল না। চাঁদপুরেও একজন লোক পাঠান হইয়াছিল, বাবুরা বলিলেন, "হরি ত এখানে নেই। সে যে কলকাতায়।"

লোকটি সতীর কথামত তাহাকে সংবাদ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া আসিল। কিন্তু সতী বুঝিল, ভ্রাতা সে সংবাদ পায় নাই।

ক্রমে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। সকলে যখন জাহ্নবীকে লইয়া কার্য্যস্থানে বসাইতে গেল, জাহ্নবী তখন একটু যেন সচেতন হইলেন। এ কয়দিন তিনি যেন জড়ের মত ছিলেন, কন্যারা যাহা বলিয়াছে, তাহাই শুধু করিয়া গিয়াছেন। আজ তিনি বলিলেন, "আমি কেন এ কাজ করব সতি? হরি?"

সতী মুখ নামাইয়া বলিল, "দাদা ত বাড়ী নেই, মা।"

"বাড়ী নেই! খবর পাঠাসনি?"

"পাঠিয়েছি। দাদা বোধ হয় তা পায়নি। দাদা কল্‌কেতায়।"

জাহ্নবী চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে কালীকে দিয়ে করাও, সে যা পার্‌বে, তাতেই তাঁর তৃপ্তি হবে।"

ষষ্ঠবর্ষীয় বালক সমস্ত দিন উপবাস করিয়া পিতৃকৃত্য সমাপন করিল। কাজ শেষ হইলে, নির্জীব-প্রায় বালককে মাতার ক্রোড়ে দিয়া সতী বলিল, "মা, এখন এর পানে একটু চাও, নইলে একেও যে বাঁচাতে পার্‌ব না। একটু সুস্থ হও মা, না হলে আমরাই বা কার মুখ চেয়ে দাঁড়াব?"

জাহ্নবী তখন উঠিয়া বসিলেন, স্বহস্তে বালককে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইয়া ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। গ্রামের কয়েকজন ধনী স্বতই উপযাচক হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কয়েকটি

মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রামশঙ্করের দারিদ্র্য-জীর্ণ আত্মার তৃষ্ণা ক্ষুধার কথঞ্চিৎ উপশম হইল।

হরিশঙ্করকে লইয়া বাবুরা তখন কলিকাতায় "দুর্গেশনন্দিনীর" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। কারণ তাঁহাদের ক্লবেও সম্প্রতি এই নাটকখানির অভিনয় হইবে। আয়েষার অভিনয় দুরস্ত করাইবার জন্যই হরিকে লইয়া যাওয়া। ফিরিয়া যে দিন তাঁহাদের অভিনয়, সেই দিনই হরির বাপের শ্রাদ্ধ। পাছে অভিনয় পণ্ড হয়, তাই আর হরিকে তাঁহারা কোন কথা জানান নাই। চাঁদপুর ও মজুতপুরের মধ্যে ক্রোশ তিনেকের মাত্র ব্যবধান। এ নগণ্য মৃত্যুসংবাদও সেখানে তেমন প্রচার লাভ করে নাই।

যাহা হউক, অভিনয় হইয়া গেল। আয়েষার সুখ্যাতিতে গ্রাম মুখর হইয়া উঠিল। অত্যন্ত সুখী হইয়া, কি জানি কেন, সহসা হরি ভাবিল, একবার বাড়ী যাওয়া যাক। বাবুরা কিছু বলিলেন না, হরি মজুতপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

রামশঙ্করের মৃত্যুর পর তখন পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য পরিবারকে এই কয় দিনের মধ্যেই শোকোচ্ছ্বাসের বেগ কমাইয়া আনিতে হইয়াছে। তাহাদের শোক করিবার অবসরই বা কোথায়! শ্রাদ্ধ-শেষে অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহাতে এ কয়দিন সংসার এক রকমে চলিতেছে বটে, কিন্তু আঁধার-ঘন ভবিষ্যতের কঙ্কাল ছায়া সতী-সাবিত্রীর মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারা ধীরে ধীরে মাতার শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া বাঁশের 'সাঙ' হইতে পাট টানিয়া লইয়া জলে ভিজাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। কার্পাস হইতে সুতা তুলিবার জন্য চরকা প্রভৃতি চৌকীর তল হইতে বাহির করা

হইয়াছে। আহার শেষ হইলে সকলে জাহ্নবীকে দাওয়ায় একখানা মাদুরের উপর নিদ্রিত কান্তীর নিকট শোয়াইয়া দিল। তিনি শুইয়া পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া শূন্য নয়নে কড়ির পানে চাহিয়া ছিলেন। মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছিল। তাঁহার বহু দিনের গ্রথিত জীবন আজ গ্রন্থিহীন সজ্জাহীন, বিপর্য্যস্ত। পৃথিবী তেমনি হাসিতেছে, দিন তেমনি চলিয়াছে, সূর্য্য তেমনি উজ্জ্বল, চন্দ্র তেমনি অংশুমালী, রজনী তেমনি তারায় ভরা! চারিদিকে কি এ নির্দ্দয়তা! ইহারা একদিনও কাহারো জন্য শোক করে না! কিন্তু আবার তাঁহার চিত্তই কি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন নয়?

হরি সহসা বাড়ী ঢুকিতে পারিল না। মনে হইল, কি যেন কি-একটা হইয়া গিয়াছে! বাড়ী যেন একান্ত শ্রীহীন, মলিন, তমসাচ্ছন্ন। মনে হইল, হয়ত পিতার ব্যারাম বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে। ত্রস্ত পদে প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া সে ডাকিল, "বাবা!"

সতী ও সাবিত্রীর হাত হইতে আরব্ধ কাজ স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, জাহ্নবী শিহরিয়া প্রাঙ্গনের পানে চাহিলেন, মনে হইল,—তিনি কি ফিরিয়া হরির সঙ্গে আসিয়াছেন! দেখিলেন, না, হরি একা। জাহ্নবী চক্ষু মুদিলেন।

হরি আবার ডাকিল, "বাবা।" নিদ্রা ভাঙ্গিয়া ধড় মড় করিয়া উঠিয়া জ্যেঠাইমা প্রাঙ্গনে আসিয়া পড়িলেন, "ওরে হরিরে, বাবারে! তোর বাবা আর নেই যে রে বাবা! আজ ষোল দিন সে চলে গিয়েছে রে বাবা! এসে আগুন-পিণ্ডিটাও দিলিনে রে বাবা—এমন কুপুত্তুরও তুই জন্মেছিলি রে বাবা—"ইত্যাদি।

হরি সহসা বসিয়া পড়িল। ইহাও কি সম্ভব? সম্মুখে সাবিত্রীকে দেখিয়া বিকল কণ্ঠে সে বলিল, "সাবি, কি হয়েছে,—

কি? এ্যাঁ—? বাবা নেই? এ কি সত্যি সাবি? না, না, তাও কি হয়!"

সাবিত্রী দুই হাতে মুখ ঢাকিল। মা দাওয়ায় শুইয়া ছিলেন। তাঁহার পানে হরির দৃষ্টি পড়িল,—পরিধানে তাঁহার শ্বেত বস্ত্র,—রুক্ষ কেশ, শীর্ণ পাণ্ডুর ছবি—দীন রমণী! এই কি তাহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা হাস্যময়ী মা! হরির পাষাণ চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সাবিত্রী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "একবার মার কাছে চল দাদা।"

"মার কাছে—না, না, এখন আর যেতে পারব না। এখন আমি যাই।"

সতী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কঠিন স্বরে বলিল, "যা করেছ, তার ত প্রায়শ্চিত্ত নেই, এখন মাকে একটু ভাল করতে চেষ্টা কর, ছোট ভাইটেকে বাঁচাও। পালিয়ে আর করবে কি! যাও, মার কাছে গিয়ে বসো গে।" সে কথা লঙ্ঘন করিতে হরির সাহস হইল না। উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র জ্যেঠাইমা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ছুঁসনে, কারুকে ছুঁসনে, আগে চান কর্।"

সতী ভাবিয়া বলিল, "তবে খিড়কীর পুকুরে চল। ঘাটে এখন আর যেতে হবে না।" বাটী হইতে বাহির হইলে হয় ত সে পলাইবে, ইহা ভাবিয়া সে নিজে সঙ্গে গিয়া খিড়কির নিকটস্থ পুকুর হইতে তাহাকে স্নান করাইয়া আনিল। স্নানান্তে হরি গিয়া মাতার নিকট বসিয়া নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল।

জাহ্নবী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "কেঁদে আর কি করবে! তিনি তোমার উপর রাগ ত্যাগ করে

গেছেন, তোমায় আশীর্ব্বাদ করেই গেছেন। ভাল হও, সুখী হবে।"

হরি বাবুদের উদ্দেশে অনেক গালি দিল। শপথ করিল, আর সে তাঁহাদের সংসর্গে যাইবে না। কয়েক দিন সে বাটীতেও রহিল। সতী ভাবিল, সত্যই বুঝি দুঃখে পড়িয়া সে শুধরাইল। কিন্তু দুই দিনেই বুঝিল যে, সে আশা বৃথা!

হরি দুই একদিন ইতস্তত করিয়া সতীকে বলিল, "দেখ্ সতি, বসে 'থাক্‌লে ত' চলবে না—একটু কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বেরুই। মধ্যে মধ্যে আস্‌ব। এই দশটা টাকা আমার কাছে আছে, এই ক'টা নিয়ে আর যে রকম করে চালাচ্ছ, সেই রকমেই সংসার চালাও। আমি শীগ্‌গিরই সব ভার নেব—তোমার কোন ভয় নেই। যদি এর মধ্যে বিশেষ দরকার পড়ে ত চাঁদপুরে বাবুদের বাড়ীর ঠিকানায় আমায় চিঠি বা লোক পাঠিয়ো, আমি আস্‌ব,—বুঝেছ? এখন চল্‌লাম—বসে থাকলে ত চলবে না।"

সতী বুঝিয়া নীরবে টাকা কয়টি লইল। সাবিত্রী করুণ স্বরে বলিল, "আর দুদিন থাক না, দাদা! মা তোমায় দেখে একটু ভাল আছেন, এর পর না হয় যেয়ো।"

"পাগল আর কি! বসে থাকলে কি চলে! স্থাখ্, এখন মাকে বলিস্‌নে, কি জানি, কাঁদবেন কাটবেন। আমি যাই, তার পর বলিস।"

সন্ধ্যার পর জাহ্নবী সাবিত্রীকে নিকটে ডাকিয়া তাহার অর্দ্ধ-জটাযুক্ত রুক্ষ ধূলিময় কেশরাশি [illegible]য়া একটু পরিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। সাবিত্রীর চক্ষু হইতে কয়েক ফোঁটা

জল গড়াইয়া পড়িল। মার অজ্ঞাতে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া সে বলিল, "আজ থাক মা, এর পর একদিন দিয়ো।" জাহ্নবীর ক্ষীণ হস্ত দুইটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তথাপি তিনি বলিলেন, "বড় জটা পড়েচে, এর পর আর ছাড়ানো যাবে না।"

রাত্রের কার্য্য-সমাপনান্তে রান্নাঘরে তালা দিয়া কালীর দুধের বাটী হস্তে সতী কক্ষে প্রবেশ করিল। দুগ্ধটুকু শিকায় রাখিয়া দাঁড়াইতেই মাতা বলিলেন, "রান্না ঘরে তালা দিয়ে এলি যে! হরি খাবে না? তোরা খাবি না?"

"হরি খেয়েছে—রান্না ঘরে আর কাজ নেই।"

"তুই খাবি না? হরি—হরি কোথায়?"

সতী নত মুখে বলিল, "চাকরীর চেষ্টায় চাঁদপুর গিয়েছে।"

"কৈ! আমায় ত বলে গেল না!"

"তুমি কাঁদবে বলে বলেনি। বল্লে, দু-চার দিনের মধ্যে আসবে, চাকরি না করলে ত চল্‌বে না। খরচের জন্যে দশটা টাকাও দিয়ে গিয়েছে।"

জাহ্নবী ক্ষণেক নীরবে রহিলেন, পরে একটু নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "কাঁদব কেন—সে যাতে সুখী থাকে, থাকুক।" সাবিত্রীর চুলের জটা ছাড়াইতে ক্ষণেক চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত স্বরে তিনি বলিলেন, "সতি—সাবির মাথাটা পরিষ্কার করে দে ত মা, আমি পারলুম না।"

সতী সাবিত্রীর মাথা লইয়া বসিল, সাবিত্রী আপত্তি করিল। সতী তাহাকে একটু তিরস্কার করিয়া দ্রুত হস্তে মস্তক পরিষ্কার করিয়া দিল। জাহ্নবী শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। সাবিত্রী তাঁহার

বক্ষের নিকট মস্তক রাখিয়া দক্ষিণ হস্তটি তাঁহার গাত্রে দিয়া শয়ন করিল। সতী বলিল, "মা একটু জল খাও।"

"না মা, আমায় বিরক্ত করো না, আমার একটু ঘুম আসছে।"

সতী বুঝিত, মাতার এই নিস্পন্দ নির্ব্বাক চিন্তা ঠিক ঘুমের মতই তন্ময়তা-পূর্ণ। মাতা সে সময় কাহারও কথা সহিতে পারেন না। অগত্যা সে উঠিয়া নিদ্রিত ভ্রাতাকে তুলিয়া দুগ্ধ পান করাইয়া বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া ঘুম পাড়াইল। গাভীর এই দুগ্ধটুকুই বালকের জীবন—সে জন্য সে গাভীর যত্নে এতটুকু ত্রুটি করিত না।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। সেদিন গরমও ছিল, অসহ্য। দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া সতী জানালার নিকট আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। দীর্ঘ জটাসঙ্কুল চুলগুলা শৈবালের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাহিরে আষাঢ়ের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ, একটিও তারা নাই—কোথাও এতটুকু আলো নাই। স্তম্ভিত পৃথিবী যেন তাহারি মত মলিন অঞ্চল পাতিয়া একধারে পড়িয়া আছে,—অবসাদময়, বিষাদগ্রস্ত! প্রভাতে যেন আর সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না!

সতী বুঝিতে পারিল না, বুকের উপর কেন এ পাষাণের মত গুরুভার চাপিয়া বসিয়া আছে। যখন কার্য্যের মধ্যে সে আপনাকে মগ্ন রাখে, তখন সে বেশ থাকে। একটু অবসর পাইলেই এ ভার আবার তাহাকে চাপিয়া ধরে। কতকাল আর এ ভাবে যাইবে! এ ভার কি কখনও নামিবে না? কত যেন কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, অথচ কান্না আসে না।

পৃথিবীর পানে চাহিয়া সে ভাবিল, উঃ, কি এ অন্ধকার!

এ অন্ধকারের কি বিরাম নাই! আকাশের পানে সে চাহিয়া দেখিল, একটা তারা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে! ভাবিল, ঐ কি আমার বাবা! তিনি যে আমায় ডাকিয়া গিয়াছেন! আমায় কি এখনও ডাকিতেছেন?—ভাবিতে ভাবিতে সহসা সে দেখিল, তারাটা যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বল বিকট চক্ষে তাহার পানে চাহিল! সতী সভয়ে জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া মাতার পার্শ্বে আসিয়া শুইয়া পড়িল। একবার নিদ্রিত ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতাকে স্পর্শ করিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "না, না, আমি যেতে চাই না।"

তিন মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে হরি আর একবার আসিয়া কয়েকটা টাকা দিয়া গিয়াছিল। তাহাতে এবং তিন জনের পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে সংসার এক প্রকারে চলিতেছিল।

সেদিন প্রভাতে সতী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিল, এখন আর সে বড় নদীর ঘাটে যায় না—সাবিত্রী গরুকে জাব দিতেছিল, এমন সময় পিয়ন আসিয়া হাঁকিল, 'চিঠি'। কালী পত্র আনিয়া মাতার হস্তে দিল। মাতা তুলসীতলা নিকাইতে নিকাইতে বাম হস্তে কার্ডখানা পড়িলেন; পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেই সিক্ত কর্দ্দমময় স্থানেই বসিয়া পড়িলেন।

সতী স্নান করিয়া আসিল। রান্নাঘরে কলসী রাখিয়া মাতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা, কি হয়েছে, মা? কাঁদছ কেন?" মাতা নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন।

কার্ডখানা পড়িয়া রহিয়াছে। সতী তুলিয়া লইয়া পড়িল, নবগ্রামবাসী তিনকড়ি লাহিড়ী প্রভৃতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র তাঁহার বিমাতাকে ইহা জ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখিয়াছেন

এবং সবান্ধবে তাহার ভবনে গিয়া পারলৌকিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

সতীও অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। পত্রখানা হাতে করিয়া দিদি দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া সাবিত্রী বিস্মিতভাবে নিকটে আসিল। দিদির হস্ত হইতে পত্রখানা টানিয়া লইয়া সে পড়িয়া দেখিল। পড়া শেষ হইলে একবার দিদির মুখপানে চাহিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে সে কাঁদিয়া উঠিল, "মা, ও মা, মাগো।"

জ্যেঠাইমা ছুটিয়া আসিলেন, রোদন-নিরতা সাবিত্রীর নিকট হইতে বহু কষ্টে অর্থ জানিয়া লইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ধরিলেন। ক্রমে পাড়ার লোক আসিয়া জুটিল, সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল! বাড়ীতে বেশ-একটু সোরগোল পড়িয়া গেল। জাহ্নবী কেবল দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন। এ রোদন যেন উপহাস-মাত্র! যে দিন সতীর বিবাহ হইয়াছে, সেই দিনই ত এ রোদন সারিয়া রাখা হইয়াছে, তবে আর কেন!

বেলা অনেক হইল। জ্যেঠাইমা বলিলেন, "যা হবার, তা হ'ল! সতী, আয় মা, ডুবটা দিয়ে আসবি।"

সতী স্থির কণ্ঠে বলিল, "পুকুরে নাইলে হবে?"

সকলে বলিল, "তা কি হয়? নদীতে যেতে হবে।"

সতীর ভাব দেখিয়া সকলে মনে মনে নিন্দা করিতেছিল, এ কি মেয়ে, বাপু! না হয় ঘরই না করিয়াছিস্—স্বামী ত, বিবাহ ত করিয়াছে। তা একটু কাঁদিল না! মাগো!

জ্যেঠাইমা সতীর হস্তের শাঁখের চুড়ি ও লোহা ভাঙ্গিতে গিয়া সত্য সত্যই কাঁদিয়া উঠিলেন। সতী নিজেই একটা ইটের আঘাতে সেগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

স্নানান্তে শুভ্র থান পরিয়া, সিঁদুর ও হাতের লোহা ও চুড়ি কয়গাছা বিসর্জ্জন দিয়া, সতী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সহজভাবেই বাটী চলিল। সকলে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়াই একটা অব্যক্ত ক্ষোভে তাহার হৃদয় অবসন্ন হইতেছিল। দ্বারের বাহিরে আসিয়া জ্যেঠাইমা ডাকিলেন, "কালী, নিমপাতা দিয়ে যা। সতী, এখন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিস্‌নে। নিমপাতা দাঁতে কাট্, আগুন ছোঁ, তবে যাবি।"

সহিষ্ণু ভাবে সতী যথা-কর্ত্তব্য পালন করিল। সাবিত্রী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় কে বলিল, "সাবি, তুই এখন সরে যা—দিদির মুখ দেখিস্‌ নে।" সতী তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিল। সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া, "ওগো দিদি, তোমায় এমন সাজে কে সাজালে" বলিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। সকলে যুগপৎ তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। সতী তখন সেইখানে বসিয়া পড়িল, তাহার স্কন্ধে মাথা দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া সাবিত্রী কাঁদিতেছিল, তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সতী মৃদু স্বরে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

জ্যেঠাইমা আসিয়া জাহ্নবীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এখন ওঠ, কপালে যা ছিল, হল। মেয়েটাকে একটু জল খাওয়াও। ভেবে আর কি করবে!"

জাহ্নবী উঠিলেন, সতীর নিকট যাইতেই সতী উঠিয়া দাঁড়াইল। কন্যার বিধবা-মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার বিশাল ধৈর্য্য আর বাঁধ মানিল না। আর্ত্ত স্বরে তিনি একবার চীৎকার করিতে গেলেন, শব্দ বাহির হইল না। কন্যাকে শুধু দুই বাহুর মধ্যে তিনি টানিয়া লইলেন।

অনেকক্ষণ পরে জাহ্নবী বলিলেন, "সতী! চল্ মা, একটু সরবৎ মুখে দিবি।"

নত মুখে সতী বলিল, "আমার ত' তেষ্টা পায়নি। তুমি একটু খাও, আমি রান্না চড়াইগে।"

"রান্না তোমার জ্যেঠাইমা চড়িয়েছেন। তুমি ত আজ রাঁধবে না।"

"ওঃ!" বলিয়া সতী সেইখানে বসিয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দেবীর তীর্থ ভ্রমণ শেষ করিতে প্রায় এক বৎসর লাগিল। সেবার বিশ্বেশ্বর পশ্চিম যাইবে বলিয়াছিল, কিন্তু কার্য্য-গতিকে যাওয়া হয় নাই। উভয়ে এবার বহু তীর্থ ঘুরিলেন। সাবিত্রী, গায়ত্রী, পুষ্কর, ভাস্কর, কামাখ্যা, চন্দ্রনাথ, হরিদ্বার প্রভৃতি কষ্টসাধ্য তীর্থগুলিও এবার সারা হইল। এ সব তীর্থে মাসিমার এত দিন পর্য্যটন হয় নাই, এবার যদি বাহির হইয়াছেন ত' সব সারিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

যাবজ্জীবন গৃহ-কোটরে আবদ্ধ বিশ্বেশ্বর যেন এক নূতন জগতের জীব হইয়া পড়িয়াছিল, আজ এখানে, কাল সেখানে, কখনও স্নান, কখনও দেবদর্শন, কখনও পর্ব্বতারোহণের আনন্দে সে এক প্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথে গিয়া সে বলিল, "মাসিমা, আর কোথাও গিয়ে কাজ নাই। এস, এইখানেই একটা ঘর বেঁধে, আমরা থাকি।" মাসিমা একটু হাসিলেন। সমস্ত

পশ্চিম ভ্রমণ করিয়া সে সুখীও যতদূর হইল, দুঃখিতও ততখানি হইল। সেবার দুর্ভিক্ষের করাল মূর্ত্তি সারা পশ্চিম গ্রাস করিয়াছিল। একদিন সে মাসিমাকে বলিল, "মাসিমা, আমাদের দেশে বাস না করে এই সব দেশে বাস করলে ত হয়।"

মাসিমা বলিলেন, "কেন ?"

"দেখ দেখি, কি গরিব দেশ! হা অন্ন, হা অন্ন করে সাধারণ লোকগুলো কি করে বেড়াচ্চে! কার কি করতে পারি বলে কাজ খুঁজে এখানে বেড়াতে হয় না। দারিদ্র্য যে কি, তা পশ্চিমে দুর্ভিক্ষের সময় এলে বেশ বোঝা যায়।"

মাসিমা একটু ম্লান বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের দেশেও কি গরিব নেই, ক্ষেপা ?"

"কোথায়! যারা আছে, এদের সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। আমাদের দেশ শস্যশ্যামলা, সুজলা, সুফলা, কিছু না থাকলেও অনাহারে কাউকে মরতে হয় না।"

"তা ঠিক! কিন্তু একবার রামশঙ্কর ভটচাযদের কথা মনে করে ত্থাখ্ দেখি।"

"তা দেখেছি। কিন্তু এ সব দেশ হলে কোন্ দিনে তারা মরে যেত। বাঙলার গ্রাম বলেই এখনো ভদ্রতা রেখে দিন কাটাচ্চে। দেখ মাসিমা, যে দেশে অভাব নেই, সে দেশে কিছু করা যায় না, করতেও লজ্জা হয়। যারা গ্রহণ করবে, তারাও লজ্জা পায়, কেন না, তারা ত কায়-ক্লেশে এক রকমে দিন কাটাচ্চে! সাধারণের চোখে তারা একেবারে ভিক্ষুকের বেশ সহজে ধরতে চায় না। যে দেশে সে সঙ্কোচমাত্র নেই, সাহায্যের অভাবে যারা দিন-রাত্রি মরে যাচ্চে, সেই দেশে এসেই

বাস করা উচিত। বিনা-আয়াসে অনেক কাজ কর্‌তে পারা যায়।”

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন, “কি কাজ করতে পারা যায়? কি তুই কর্‌তে চাস্‌, শুনি?”

বিশ্বেশ্বর অধোবদন হইল। লজ্জার আভাসে তাহার আগণ্ড-কর্ণমূল ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। মুখে বড় বড় কথা বলা তাহার সাধ্যের অতীত। ভাবের আধিক্যে হৃদয় যখন অত্যন্ত আলোড়িত, তখন সে একেবারে বাক্যহীন হইয়া পড়ে। এইজন্যই দেশে একটা অতিথিমণ্ডপ প্রস্তুত করাইতে করাইতে সহসা সে কার্য্য সে স্থগিত রাখিয়াছে। প্রথমতঃ নিজে কি করিয়া সে লোকের কাছে প্রচার করিবে যে, আমি মস্ত ধনবান দয়ালু লোক, যে কেহ সাহায্য চাও, আমার আশ্রয়ে এস, আমি তোমাদের দুঃখ দূর করিব! এ কথা ভাবিতেও তাহার অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ভাবের উত্তেজনায় কাজটা আরম্ভ করিয়া ফেলিয়াছিল, সহসা সেটা সে বন্ধ করিয়া দিল। দেশের লোক ভাবিল, রেশমের দর কমিয়া যাওয়াতে বিশ্বেশ্বর তাহার কুঠী-নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত রাখিল। দ্বিতীয়তঃ সে ভাবিয়াছিল যে, এ দেশে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম, যাহারা নিঃসঙ্কোচে সাধারণের চক্ষে ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত হইয়া লোকের সাহায্য গ্রহণ করে। যাহাদের সে সঙ্কোচ নাই, তাহারা ভেক্‌ধারী বৈষ্ণব। বঙ্গের ধর্ম্মশীল গৃহস্থদিগের কল্যাণে তাহাদেরও কোন অভাব নাই। অনেক ভাবিয়া বিশ্বেশ্বর সে ইচ্ছা ত্যাগ করিল।

পশ্চিমে আসিয়া তথাকার সাধারণ অধিবাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল

যে, পশ্চিমে আসিয়া বাস করিয়া তাহার বহুদিনের সেই ইচ্ছা সে পূরণ করে। মাসিমা কিন্তু একটু ক্ষোভের হাসির সহিত তাহার সে ইচ্ছায় বাধা দিতে লাগিলেন। তিনি স্থির বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলেন যে, কুবেরের ভাণ্ডার নহিলে সে দেশের অভাব নিবারিত হয় না! বিশ্বেশ্বরের অজস্র দানে তিনি বাধা দিতেন না, কিন্তু বাটী ফিরিবার জন্য তাহাকে তাড়া দিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, যে তাঁহার বিচলিত-মস্তিষ্ক পুত্রটি অধিক দিন সে দেশে থাকিলে আরও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিবে। তাহাকে রিক্ত-সর্ব্বস্ব দেখিতে তিনি একেবারে ইচ্ছুক নন!

মাসীর ব্যগ্রতায় বিশ্বেশ্বর অগত্যা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। মাসিমা ভাত লইয়া বসিয়া আছেন,—বেলা দুইটা বাজিয়া গেল, তিনটা বাজে, বিশৃঙ্খল রুক্ষ মস্তকে, শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত দেহে, সূর্য্যকিরণদগ্ধ মলিন মুখে বিশ্বেশ্বর ফিরিয়া আসিল। সরবৎ খাওয়াইয়া, বাতাস করিয়া অনেক কষ্টে মাসিমা তাহাকে সুস্থ করিলেন। সে যে এতক্ষণ কি করিতেছিল, তাহা তিনি বেশই বুঝিতে পারিলেন।

পঁচিশ জন লোক খাইবে বলিয়া সে যখন মাসিমাকে রাঁধিতে অনুরোধ করিত, মাসিমা তখন বুদ্ধি খাটাইয়া একশত জনের উদ্যোগ করিতেন, বিশ্বেশ্বরও সে রন্ধনে আসিয়া যোগ দিত। জোল কাটিয়া বড় বড় ভাতের ডোল চাপাইয়া, গামছা-কোমরে বিশ্বেশ্বর মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। মাসিমা তরকারীর ভার লইতেন। শেষে একশত জনের স্থলে দুই শতে মারামারি বাধিয়া যাইত। তখন ভাণ্ডারের চাল বিলাইয়া ভিক্ষুকদলকে শান্ত করিতে হইত।

অত্যধিক পরিশ্রমে বিশ্বেশ্বরের শরীর কৃশ, মলিন হইয়াছিল। দুই একবার জ্বরও হইল। মাসিমা তখন জোর করিয়া একদিন পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এক বৎসর পরে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া চলিলেন। ট্রেণের মধ্যেই মাসিমা একবার বিশ্বেশ্বরকে জানাইলেন, "দেশে গিয়ে এক মাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে দেব, মনে থাকে যেন।" শুনিয়া বিশ্বেশ্বর একটু হাসিল।

বিবাহের নামে সত্যই যেন তাহার একটা আতঙ্ক জন্মিয়া গিয়াছিল। প্রথমে কি মনে করিয়া যে সে বিবাহ করিবে না সংকল্প করিয়াছিল, তাহা বলা সুকঠিন, কিন্তু এখন সে সংকল্প যেন বৃহৎকায় অশ্বত্থেরই মত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সতেজে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঝড়-বাত্যা-বৃষ্টি, এখন সে সকলই উপেক্ষা করিতে পারে। সামান্য কল্পনার অঙ্কুর, এখন সুদৃঢ় পাষাণভেদী মূলে পরিণত হইয়াছে। প্রথম যখন সে বিবাহ করিবে না বলিয়াছিল, তখনকার সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অবিরাম নীরস গ্রন্থ-চর্চ্চাই তাহার কারণ। যদি তাহার মাতা, ভগিনী বা স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্কীয় কেহ সে সময় থাকিত ত বোধ হয় তাহার এ ভাব জন্মিতে পারিত না। মাসিমা তখন সংসারে নূতন আসিয়া কেবল কর্ত্তব্যই পালন করিয়া যাইতেন, পরের ছেলেকে অত বেশী ঘনিষ্ঠ করিতে চাহিতেন না।

কিন্তু এখন বৃদ্ধ বয়সে সে দর্প তাঁহার চূর্ণ হইয়াছে! কেবল বিশ্বেশ্বরই নারী-সঙ্গ-অসহিষ্ণু হইয়া গঠিত হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানচর্চ্চার অবসরে সে যখন কাব্য ও সাহিত্য আলোচনা করিত, তখন তাহার মধ্যে নারী জাতির প্রাধান্য দেখিয়া সে আরও ভীত হইয়া পড়িত। একজন সামান্য বালিকা বা নারী কিরূপে যে

পুরুষের বিস্তৃত জীবনের সর্ব্ব সুখ-সার্থকতার কেন্দ্র-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না ; অথচ দেখিত, ইহাই কাব্য সাহিত্যের প্রাণ ; অতএব জগতেরও প্রাণ। কিরূপে এই মোহময় আত্মবিস্মৃতি হইতে নিজে রক্ষা পাইবে, সেই চেষ্টায় সে সমস্ত প্রাণ-মন প্রয়োগ করিত। আপনাকে বিবাহিত কল্পনা করিয়া এক একবার মানস চক্ষে আপনার অবস্থাও, সে পর্য্যবেক্ষণ করিত। সমস্ত সুখ-কল্পনা একটি বালিকার সুখ-দুঃখে পর্য্যবসিত! চিন্তার শেষ, কার্য্যের শেষ, সেই একটী বালিকায়। সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত স্নেহ, ভালবাসা, সৌন্দর্য্য, সব সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত! এই কি মানুষের আকাঙ্ক্ষিত জীবন? এই যদি সুখ, শান্তি, তৃপ্তি,—তবে দাসত্ব আর কাহাকে বলে!

যখন সে গ্রামের নিকট পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দূরে গ্রামের শ্যামল রেখা ম্লান চন্দ্রকিরণে চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। মাঠের চির-পরিচিত বায়ু সাদরে যেন তাহার চুলগুলা লইয়া নাড়িতে লাগিল, চিবুক ধরিয়া সস্নেহে যেন কুশল প্রশ্ন করিল। সহসা বিশ্বেশ্বরের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার শৈশবে-অন্তর্হিতা জননী ঐ গ্রামের আম্রবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া স্নেহ-সজল চক্ষে প্রবাস হইতে আগত পুত্রকে সম্ভাষণ করিতেছেন। সে তীব্র আনন্দের প্রতিঘাত একটু সম্বরণ করিয়া লইতে বিশ্বেশ্বর ক্ষণেক দাঁড়াইল ; সহসা পথের উপর নত হইয়া মাটীতে ললাট স্পর্শ করিয়া সে কাহাকে প্রণাম করিল। মাসিমা গো-শকটে ছিলেন, নহিলে হয়ত পুত্রের কাণ্ড দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিতেন।

বাটী পৌঁছিয়া মাসিমা আগে গরুগুলি দেখিতে গেলেন। পুরাতন ভৃত্য ঘোষ এবং নিধের মা বাড়ী-ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কারই রাখিয়াছিল। তথাপি যে সব ঘর তালা-দেওয়া ছিল, সে সব ঘরের মূর্ত্তি দেখিয়া মাসিমা প্রবাসে যাওয়ার বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তীর্থ হইতে যে সব তৈজস, বস্ত্র ও প্রসাদ প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, তাহা প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে বণ্টন করিবার ব্যগ্রতা সম্প্রতি সম্বরণ করিয়া উপবাসী ছেলের জন্য রন্ধন চাপাইয়া দিলেন। ছেলে কিন্তু তখন পাড়াময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কাহারও বাড়ীতে যাওয়া তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু আজ এক একবার সে ইচ্ছাও হইতেছিল।

পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া ইচ্ছাটা প্রশমিত করিয়া একবার সে তাহার কলাবাগান দেখিতে গেল। ক্ষীণ সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছে, কলা-বাগানের সবই অন্ধকার! সস্পৃহ নয়নে একবার সে বৃক্ষগুলার পানে চাহিয়া ফিরিয়া চলিল। গ্রামের প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক গৃহ যেন কতই সুন্দর বোধ হইতেছিল। রাস্তায় নাথু মণ্ডল, পরাণ কলু, বিপিন বেনে প্রভৃতি তাহার নিতান্ত অপরিচিত লোকগুলাও যখন "দাদাঠাকুর কবে এলে গো?" বলিয়া তাহাকে নমস্কার করিল, তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। আজ যেন এ গ্রামের সামান্য লোকটার সঙ্গও তাহার একান্ত স্পৃহনীয় বোধ হইল!

দক্ষিণ পার্শ্বে ভট্টাচার্য্যের বাটী, অন্ধকারে কয়েকটা স্তূপের মত দেখাইতেছে। বিশ্বেশ্বর একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, ইচ্ছা হইল, একবার 'ভট্চায মশায়' বলিয়া ডাকে, কিন্তু সহসা সেই বিবাহের

প্রস্তাব মনে পড়ায় আর ডাকা হইল না। ভাবিতে ভাবিতে বিশ্বেশ্বর আবার চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূরে উমেশ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা-ঘর। রোয়াকে গৃহস্বামী স্বয়ং বসিয়া তামাকু টানিতেছেন, বিশ্বেশ্বর একেবারে গিয়া সেখানে উঠিল।

গৃহস্বামী বলিলেন, "কে ?"

"আমি বিশ্বেশ্বর।"

"বিশ্বেশ্বর! এস বাবা, বস। পশ্চিম থেকে কবে ফিরলে? ভাল আছ ত ?"

বহুক্ষণ সেখানে গল্প করিয়া, গ্রামের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া অনেক রাত্রে বিশ্বেশ্বর বাটী ফিরিল। থালে করিয়া ভাত বাড়িয়া ঢাকা দিয়া মাসিমা বসিয়া ঢুলিতেছিলেন, বিশ্বেশ্বর কথা না কহিয়া একেবারে আসনের উপর গিয়া বসিল। সচকিত হইয়া তিনি বকিতে লাগিলেন, "ত্যাখ দেখি, ভাত কটি জুড়িয়ে জল হয়ে গেল! আজ দুদিন খাওয়া নেই—কোথায় দুটি খেয়ে একটু গিয়ে শোবে—না, এখানে এসেও সেই স্বভাব! ভোরে একটা যোগ আছে, নদীতে ডুবটা দিতে যাব, তা কখন বা শোব, কখনই বা উঠব—তোর যদি কোন কালেও—"মাসিমা আরও বলিতেন, কিন্তু পুত্রের বিষণ্ণ নত মুখ দেখিয়া থামিয়া গেলেন। সাগ্রহে বলিলেন, "এত ক্ষণ কোথায় ছিলি ?"

"উমেশ মুখুয্যের বৈঠকখানায়।"

"তারা সব ভাল আছে ত? পাড়ার সব ভাল? গাঁয়ের সবাই ভাল আছে?"

"সবার খবর কি করে বল্‌ব! তবে আমাদের রামশঙ্কর ভট্‌চায মারা গেছেন।"

মনস্তাপ পাইয়া মাসিমা নীরব হইলেন। একবার মৃদু স্বরে শুধু বলিলেন, "আহা বৌটা!—" তারপর অনেকগুলা 'আহাই' মনে আসিতে লাগিল, তাই তিনি নীরব হইলেন। আবার একবার বলিলেন, "যে মরে, সে ত' জুড়োয়! মিন্‌সে কিন্তু জুড়িয়েছে, আর সংসারের ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।" বিশ্বেশ্বর নীরবেই রহিল।

রাত্রে মাসিমা ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিলেন না, জাহ্নবীর শান্ত-সহিষ্ণু মূর্ত্তিখানি কেবলি তাঁহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল। প্রত্যূষে উঠিয়া বস্ত্র ও গামছা লইয়া তিনি নদীতে স্নানার্থ গমন করিলেন। নদীতে অনেকেই স্নান করিতেছিল। মাসিমাকে দেখিয়া সকলেই কুশল-প্রশ্নে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিল। ভট্চাযদের বড়বৌও স্নান করিতেছিলেন। তিনি কাংস্য কণ্ঠে বলিলেন, "আমরা বলি বা, আর দেশেই ফিরবে না।"

"দেশে ফিরব না কেন, দিদি—" বলিতে বলিতে তাঁহার পার্শ্বে অবগুণ্ঠিতা শ্বেত-বস্ত্রা জাহ্নবীকে দেখিয়া মাসিমাতা মুখ ফিরাইলেন। দাক্ষিণে চাহিয়া দেখিলেন,—সাবিত্রী ডুব দিতেছে, তাঁহার ইচ্ছা হইল, তাহার ম্লান মুখখানি ধরিয়া আদর করেন, কিছু জিজ্ঞাসা করেন! কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তাহাদের সহিত তিনি কথা কহিবেন? তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া ফিরিতে গিয়া তিনি দেখেন, সাবিত্রীর পার্শ্বে শ্বেত-বস্ত্রা আলুলায়িত-রুক্ষ-কেশা ও কাহার মূর্ত্তি? কে ও? ওই কি সতী? অন্নপূর্ণা নীরব নিশ্চল কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিশ্বেশ্বর আবার তাহার নিভৃত গৃহ-কোটরে পুস্তকরাশির মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু এবার আর ইচ্ছায় ও মনে কোন সামঞ্জস্য নাই। পশ্চিমে গিয়া যে জীবনের আস্বাদ সে পাইয়া আসিয়াছে, তাহার স্মৃতি আর মন হইতে কিছুতেই যেন সরিতে চাহে না। পুস্তকরাশি-সজ্জিত কাঠের তাকৃগুলাকে যেন ভারবাহী গর্দ্দভের মতই মনে হইতে লাগিল। কক্ষের সে উন্মাদনা-শক্তি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে! কুঠীর মহাজনদিগের নিকট গিয়া নিজে দেখিয়া কারবার চালাইতে সে চেষ্টা করিল, ভাল লাগিল না; মণ্ডলদের ডাকিয়া ভাগে-দেওয়া জমি-জমার, চাষ-আবাদ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের চেষ্টা দেখিল, দুই দিনে বিরক্তি ধরিয়া গেল। অগত্যা নিষ্কর্ম্মা বিশ্বেশ্বর গ্রামের নদীর তীরে, আম্র-কাননে, কদলী-বনে, মাঠে, শস্য-ক্ষেত্রের আগে আগে উদাসী পথিকের ন্যায় বেড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

কখনও বা মাসিমার নিকট সে আসিয়া বসিত। অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীও কেমন যেন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। সকল সময়ে আর তেমন হাসি ও সস্নেহে গল্প করেন না। তাঁহার প্রাণে সর্ব্বদা যে কি কষ্ট জাগিতেছে, তাহা বিশ্বেশ্বর বেশই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই সেও মাসিমার কাছে সঙ্কুচিত হইয়া বসিত। একদিন মাসিমা স্পষ্টই বলিলেন, "তুই নিশ্চিন্তি থাক্। এতদিন যদি আমার এমনি কেটে গিয়ে থাকে ত' এ কটা দিনও যাবে। যদি কখনো

তোর নিজে থেকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়, করিস্, আমি তোকে কখনো আর সে কথা বলব না।"

বিশ্বেশ্বর নীরবেই রহিল, কিন্তু দেখিল,—যে কথাটা সে কয় দিন হইতে তাঁহাকে বলি-বলি করিতেছে, এই তাহার সুযোগ উপস্থিত। সে মনে করিল, অন্নপূর্ণা আরও কিছু বলিবেন, কিন্তু সে আশা সফল হইল না। তিনি নীরবে বসিয়াই পূজার জন্য তুলার সলিতা পাকাইতে লাগিলেন।

অগত্যা বিশ্বেশ্বর বলিল, "মাসিমা, তুমি ওদের কোন খবর পাও?"

মাসিমা সলিতা পাকান স্থগিত রাখিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, "কি খবর?"

"এই এখন ওদের কি করে চল্‌ছে—"

"আমি ত আর ক্ষেপিনি যে, যাদের সঙ্গে অতি নীচের মত ব্যবহার করেছি, তাদের দুরবস্থায় আমোদ করে তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের অবস্থা জেনে আস্‌ব!"

এ তিরস্কার কানে না তুলিয়া বিশ্বেশ্বর বলিল, "তাদের বাড়ী না যাও, অন্য লোকের মুখেও ত' শোন।"

"তারা কি রকম লোক, এক সঙ্গে এতদিন থেকেও তুমি তা জান না, কিন্তু আমি খুব জানি। মরে গেলেও তারা লোকের সাহায্য নিতে ভিক্ষুকের মত হাত পাত্‌বে না, বা আপনাদের অবস্থা কারুকে জানাবে না। শুনেছি, হরি মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসে, সে হয়ত এখন দেখে শোনে।"

বিশ্বেশ্বর ভারাক্রান্ত চিত্তে বলিল, "হরি? সেটা ত' জাহান্নমে গিয়েছে। সেদিন দেখি, সে আর জমিদার নরেন—ডেপুটী

বাবুদের যে জামাই, সেই দুজনে খুব বাহার করে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। হরির সে বাবুগিরির পোষাক অনেক লোকেরই চোখে পড়েছিল। ছি ছি, তার লজ্জাও নেই!"

"কি জানি, বাছা! তার বাহার দেখেই হয় ত লোকে মনে করে, ওদের আর কষ্ট নেই।"

"মাসিমা, তুমি ওদের বাড়ী এক এক দিন গেলেই ত পার।"

অন্নপূর্ণা ক্ষণেক ভাবিয়া সবেগে বলিলেন, "না, সে আমার দ্বারা হবে না। সতীর মার কাছে আমি মুখ দেখাতে পার্‌ব না, তুমি পার ত' কোন সন্ধান নিয়ো।"

বিশ্বেশ্বর কিন্তু সহজে কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা যে কষ্টে আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কি করিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। কালীপদ বালক, তাহার দ্বারা কোন কার্য্য করিলে হয় ত জানাজানি হইয়া পড়িবে। সে তাহাতে নিতান্তই নারাজ। বিশ্বেশ্বর ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল, যে রূপেই হোক্, সতী বা সাবিত্রীর নিকট এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে এবং কোন রূপে তাহাদিগকে সাহায্য গ্রহণ করাইতেই হইবে।

এ সঙ্কল্প স্থির করা সহজ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন। একে ত' তাহার নিজের সঙ্কোচই এক দারুণ বাধা, তাহার উপর সতী বা সাবিত্রীর দর্শনও তেমন সুলভ নহে।

গরিবের ঘরের মেয়ে এবং ভাগ্য-দোষে মন্দভাগিনী বলিয়া তাহারা কোথাও বড় বাহির হয় না। কচিৎ কখন নদীর ঘাটে জল আনিবার সময় যদি বা সাবিত্রী কাহারো চোখে পড়ে, কিন্তু সতী তাহাদের বাড়ীর পশ্চাতের ডোবা বা পুকুর

ভিন্ন আর কোথাও যায় না। পল্লীগ্রামে যদিও ভদ্র কুলাঙ্গনাদের ঘাটে-পথে বাহির হওয়ায় কোন বাধা নাই, তথাপি এ স্থলে তাহাদের নিজেদের অবস্থাই ছিল সর্ব্বপ্রধান বাধা। বালিকা সাবিত্রীও এখন ক্রমে ক্রমে লোকের চক্ষে আলোচনীয়া হইয়া উঠিয়াছিল। "ও মা, এ মেয়েও ত' মস্ত হয়ে উঠেছে, বছর চোদ্দ বয়স হতে চলল,—কি করেই বা বিয়ে হবে, কে-বা নেবে!" কোন সহৃদয়া বলিতেন, "আহা, ওর দিদির যে রকম বিয়ে হয়েছিল, সে রকম বিয়ে হবার চাইতে ও অমনি থাক, তবু মনের সুখে থাক্‌বে।" অমনি ন্যায়-বুদ্ধিশালিনী সমাজ-সংরক্ষিণীরা শিহরিয়া বলিতেন, "ও মা, তাও কি হয়! ও সব কপালের কথা, বোন! কপালে যা আছে হবেই, তা বলে কি আর বিয়ে বন্ধ হয়! জাত থাকা চাই ত।"

ঘাটে-পথে বাহির হইলেই এই সব কথা উঠে বলিয়া সাবিত্রীও অতি সাবধানে চলিত। জল আনিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে এমন সময় সে ঘাটে যাইত, যে সময় গ্রামের অধিকাংশ লোকই মধ্যাহ্ন-বিশ্রামে শ্রান্ত দেহ ঢালিয়া দিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর একদিন ইহা লক্ষ্য করিল। সে ভাবিল, এই বেশ সুযোগ হইয়াছে। ইহাতে যে কিছু অন্যায় আছে, তাহাও যে সে না বুঝিয়াছিল, এমন নহে, কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ই বা আর কি! আবাল্য অদ্ভুত-স্বভাববিশিষ্ট, মুখচোরা, গোবেচারা, ভাল মানুষ বিশ্বেশ্বর পাড়ার ছেলে হইলেও একটু বড় হওয়া অবধি কাহারও বাড়ীর মধ্যে সে কখনও যায় নাই। এখন কিরূপে সে সতীদের বাড়ী গিয়া জাহ্নবী দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়! তাঁহারাই বা তাহার এ আকস্মিক কার্য্যে কি মনে করিবেন? বিশ্বেশ্বর

তাঁহাদের নিকট সঙ্কোচেরও যথেষ্ট কারণ আছে, তাহার সে অপমান এখনও হয়ত তাঁহারা মনে করিয়া রাখিয়াছেন!

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বিশ্বেশ্বর ষষ্ঠীতলার নিকট পদচারণা করিতে লাগিল। অন্যমনস্কতা-বশতঃ এক একবার সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নগা ঝুরি ধরিয়া টানিতেছিল। শীতের প্রথম সঞ্চার প্রকৃতির দেহে তখন অল্প অল্প কাঁটা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। বক্সীদের "বেড়ের" পার্শ্ব দিয়া অগ্রহায়ণের ধান্য-ক্ষেত্র কমলার স্বর্ণাঞ্চলের ন্যায়ই শোভা পাইতেছে। বেড়ের মধ্যে সরল উচ্চ নারিকেল তরুশ্রেণী ফল-ভারে যেন অবনত। কদলীকুঞ্জে ফললোভী পক্ষীর দল মহা কোলাহল বাধাইয়া দিয়াছে। দক্ষিণে বাঁশঝাড় বঙ্কিম গ্রাম্য পথের মাথার উপর ঝাঁকিয়া পড়িয়াছে, দ্বিপ্রহরের উদাস বায়ু তাহার রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া এক একবার ঈষৎ করুণ মধুর বাঁশী বাজাইতেছে। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল, শ্রী-সৌন্দর্য্যে আশায়, আনন্দে স্থানটি যেন চিত্রকরের স্বপ্ন ছবির মতই শোভা পাইতেছে! চারিদিকেই কমলার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, দূরে শুধু রুক্ষ-কেশা মলিন-বসনা দরিদ্র-বালিকা বৃহৎ কলসীর ভারে হেলিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে পথ চলিতেছে। বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসিল!

বালিকা নিকটে আসিলে, বিশ্বেশ্বর মূঢ়ের ন্যায় নীরবে রহিল, এমন সাহস হইল না যে, তাহাকে ডাকে! ডাকা দূরে থাকুক, সে এমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল যে, মনে হইল, সাবিত্রী যদি তাহাকে দেখিতে না পায় ত ভালই হয়! এ অবস্থায় তাহার সম্মুখে পড়িলে হয় ত সাবিত্রী লজ্জা পাইবে, ইহা মনে করিয়া সে নিজের নির্বুদ্ধিতায় যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। কিন্তু তাহার সে লজ্জা

ভগবান সম্বরণ করিলেন না, বাম পার্শ্বে ষষ্ঠীতলায় দৃষ্টি পড়িতেই সাবিত্রী তাহাকে দেখিতে পাইল। লজ্জিতা, সঙ্কুচিতা, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া সে একবার থামিবে মনে করিল, আবার তখনি লজ্জা সম্বরণ করিয়া আরও অবনত মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর তখন নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। বুঝিল, এখন এ সঙ্কোচটুকু না সরাইলে পরে এরূপ সুযোগ দুর্লভ হইতে পারে। অনেক কষ্টে একটু অগ্রসর হইয়া সে ডাকিল, "সাবিত্রী!"

বিস্মিতা সাবিত্রী দাঁড়াইল, কিন্তু ফিরিল না। বিশ্বেশ্বর আবার ডাকিলেন, "আমার একটা কথা আছে, তোমায় শুন্‌তে হবে—একটু দাঁড়াও।"

সাবিত্রী দাঁড়াইয়াছিল, এবার একটু ফিরিয়া একবার তাহার পানে চাহিয়া নত নেত্রে মৃদু স্বরে বলিল, "কি? বলুন।"

বিশ্বেশ্বর দ্বিগুণ বিপদে পড়িল। কি বলিয়া সে এখন কথাটা পাড়ে! ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া সাবিত্রী একটু অগ্রসর হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "তোমার দাদা হরি,—সে এখন বাড়ীতে আসে?"

"মধ্যে মধ্যে আসেন?"

"সে এখন কিছু করে?"

সাবিত্রী তাহার পানে কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কি করে?"

"এই কোন কাজ-কর্ম্ম, চাকরি-বাকরি?"

"করেন, বোধ হয়।"

"ঠিক জান না?"

সাবিত্রী নত নেত্রে বলিল, "না।"

বিশ্বেশ্বর অনেক কষ্টে আরও মৃদু স্বরে বলিল, "তোমাদের সংসার সে-ই ত চালায়?"

সাবিত্রী নীরবে রহিল। বিশ্বেশ্বর বুঝিল, সে অসন্তুষ্ট হইতেছে, তখন আর তাহার সঙ্কোচ রহিল না, তাড়াতাড়ি সে বলিল, "তুমি কিছু মনে করো না,—পাড়া-প্রতিবেশীর খবর লোকে জান্‌তে চায়, তাই এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। এতে কি তুমি অসন্তুষ্ট হবে?"

সাবিত্রী অগত্যা মৃদু কণ্ঠে বলিল, "না।"

"তোমার দাদা টাকা দেন্ কি? টাকা না হলে ত সংসার চলে না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"দেন, কখনো কখনো।"

"তাতে সব খরচ চলে? কোন কষ্ট হয় না?"

সাবিত্রী ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। বলিল, "না। আমি এবার তা হলে যাই?"

"আর একটু দাঁড়াও। তুমি আমায় নিশ্চয় বল্‌ছ না! কেন সঙ্কোচ কর্‌চ? আমি তোমাদের ভাইয়ের মত,—আমায় বল্‌বে না?"

সাবিত্রী এবার একটু মুখ তুলিয়া স্থির বিশাল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া ঈষৎ রোষমিশ্র স্বরে বলিল, "আপনি কি সকলের কাছে আপনাদের ঘরের কথা সব বলে বেড়ান,—তাই আমাকে বলতে বল্‌ছেন? আপনি ত বোঝেন, এ সব কথা কারুকে বল্‌তে নেই!"

বিশ্বেশ্বর অপ্রতিভ হইল, কিন্তু নীরব হইল না, বলিল, "এবারি

কাছে বলা উচিত নয়, কিন্তু কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তাকে বল্‌লেও কি দোষ হয় ?"

"হয় বই কি ! আর বলেই বা লাভ কি ! আমি এবার যাই !"

"শোন সাবিত্রি ! যদিও আমি পর, তবু সত্যই আমি তোমাদের বোনের মত দেখি। আমি তোমায় লজ্জা দিতে বা ঠাট্টা কর্‌বার মতলবে এ কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আপনার লোকে যেমন ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমি তেমনি ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছি, এতে কি এত দোষ হয়েছে, সাবিত্রি ? যদিও—যদিও আমি পর—তবু—"

সাবিত্রী এতক্ষণ ঈষৎ বিরক্ত ও বিস্মিত হইয়াছিল ; এখন বিশ্বেশ্বরের বেদনাযুক্ত কথা শুনিয়া সে বিরক্তি আর তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। তাহার এমনও বোধ হইল, যেন বিশ্বেশ্বরের বৃহৎ চক্ষু জলে ভরিয়া চক্‌-চক্‌ করিতেছে। লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া অধোমুখে ক্ষীণ কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল, "আমায় মাপ করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমাদের কিছু কষ্ট আছে কি না ! সত্যই বলছি, আমাদের ত তেমন কোন কষ্ট নেই। দিন ত বসে থাকে না, কেটে যায়।"

বিশ্বেশ্বর একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "তা জানি, দিন সকলেরই কাটে, তবে হয় সুখে, নয় দুঃখে।"

"আমি, দিদি,—আমরা অনেক কাজ করি। মা এখন বড় পারেন না। তাঁর অসুখ। দাদাও কিছু কিছু আনেন, কষ্ট এমন খুব বেশী আমাদের নেই।"

বিশ্বেশ্বর বুঝিল, আজন্ম দুঃখে লালিতা বালিকার দুঃখ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন বিচার-বোধ নাই। অগ্রসর হইয়া সে বলিল,

"তোমার দাদা দিলে তোমরা তা নাও, আর আমি যদি তোমার মাকে প্রণামী বলে বা ছোট বোন্ বলে তোমাদের কিছু দি, তা হলে কি পর বলে ফিরিয়ে দাও?"

সাবিত্রী অধিকতর বিস্মিত হইল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "আমি তা বল্‌তে পারি না, দিদি জানে, মা জানেন।"

"তা হলে এই কাগজখানা তোমার মার পায়ে আমার প্রণামী বলে দিয়ো।" বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বর নিকটে আসিয়া সাবিত্রীর ছিন্ন অঞ্চলে কি একটা কাগজ বাঁধিয়া দিল। সাবিত্রী উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিল, "না, না, আপনি মার কাছে দেবেন, তা হলে। আমায় কেন মুস্কিলে ফেল্‌ছেন! আমি ও পার্‌ব না,—আপনি নিজে গিয়ে যা বল্‌তে হয়, বল্‌বেন—"

বিশ্বেশ্বর ততক্ষণে নিজের কাজ সারিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—সে বলিল, "তুমি দিয়ো, তার পর তিনি আমায় ডাক্‌লে আমি গিয়ে সব বল্‌ব। তুমি আমার নাম করে বলো। বাড়ী যাও, অত বড় কলসী নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্চ, আর দাঁড়িয়ো না—যাও।"

কথাটা বলিয়া বিশ্বেশ্বর অদৃশ্য হইল। একেবারে সে বাটী গিয়া উপস্থিত হইল,—ভিতরে গিয়া ডাকিল, "মাসিমা।"

মাসিমা তখন আহারান্তে একখানা কম্বল বিছাইয়া শীতের নিস্তেজ রৌদ্রটুকু উপভোগ করিতে করিতে কাশীদাসের মহাভারত পড়িতেছিলেন—

"সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী
পরম লজ্জিত হয়ে কন্ মৃত্যুপতি,
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা,
পবিত্র হইবে লোক শুনি এই কথা।

বিশ্বেশ্বর গিয়া তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িল, কহিল, "কি পড়ছ, মাসিমা ?"

মাসিমা সস্নেহ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, "সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়ছি,—তুই কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িস নি ?"

বিশ্বেশ্বর একটু হাসিয়া বলিল, "পড়েছি বই কি ! খুব ছোটবেলায় পড়েছি। এখন কিন্তু মহাভারতের কিছু মনে নেই, তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিছু-কিছু মনে আছে। শুনবে—

"রাবণ বলে বানরা শোন্ তোরে বলি
কোথা হতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি,
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে,
বনের বানর তুই রাক্ষসের ঘরে !"

আরও বলছি শোন, অস্ত্রের নাম শোন,—

"সূচীমুখী শীলিমুখী ঘোর দরশন,
সিংহদন্ত বজ্রদন্ত, বাণ বিরোচন,
কৃতান্ত ঐশিক বাণ, বাণ সপ্তশির—"

মাসিমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই সব মনে আছে, আর ভাল জায়গা কোথাও মনে নেই ?"

"বাঃ ! ও সব জায়গা বুঝি কম ভাল ? তখন ত ঐ জায়গাই বেশী ভাল লাগ্‌ত। যাক্ মাসিমা, তোমার সাবিত্রীর উপাখ্যানটা বেশ লাগ্‌ল ! পড় না একটু, শুনি।"

পুত্রকে ঈষৎ প্রফুল্ল দেখিয়া মাসিমা খুসী হইয়া সাবিত্রীর উপাখ্যানের প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বেশ্বর

নিবিষ্ট মনে শুনিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে সে যখন উঠিয়া যাইবে, তখন মাসিমা বলিলেন, "কেমন লাগ্‌ল রে?"

"বেশ।"

পরদিন প্রভাতে কি একটা প্রয়োজনে মাসিমার নিকট আসিয়া সে দেখিল, সাবিত্রী এক সাজি শিউলি ফুল লইয়া মাসিমাকে দিতে আসিয়াছে। মাসিমা স্নেহ-বাক্যে তাহাকে অভিনন্দিত করিতেছেন। বিশ্বেশ্বরের কেমন মনে হইল, সাবিত্রী হয় ত তাঁহাকে কিছু বলিতে আসিয়াছে। কি কথা? হয় ত কোন অভাবের কথাই বা জানাইতে আসিয়াছে! নহিলে আর কি কাজ হইতে পারে! আনন্দোৎফুল্ল বিশ্বেশ্বর নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল, গুটিকয়েক শেফালি ও কুন্দ লইয়া সাবিত্রী তাহারই কক্ষাভিমুখে আসিতেছে। সে বুঝিল, তাহার পুষ্পানুরক্তির জন্য মাসিমা প্রত্যহ যে ফুল কয়টি তাহার ঘরে রাখিয়া যান, তাহাই আজ সাবিত্রীর হাত দিয়া তিনি পাঠাইতেছেন! মাসিমার এ ক্ষুদ্র আদেশ সাবিত্রীর পক্ষে ভালই হইয়াছে। সাবিত্রী দ্বারে উপস্থিত হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করায় বিশ্বেশ্বর স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "এস সাবিত্রী।"

সাবিত্রী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, ফুল কয়টি টেবিলে একখানা পুস্তকের উপর রাখিতে রাখিতে মৃদু স্বরে বলিল, "আপনার মাসিমা এই ফুলকটা ঘরে রেখে যেতে বল্লেন।"

"ওই খানেই থাক্। তুমি কি মাসিমাকে কেবল ফুল দিতেই এসেছ, না আর কোন কথা আছে?"

বালিকার ঈষৎ পাণ্ডুর আভাযুক্ত গণ্ড রঞ্জিত হইয়া

উঠিল, নত নেত্রে মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "হ্যাঁ। শুধু শুধু কি করে আসি, তাই ফুল এনেছিলুম।" বলিতে বলিতে অঞ্চল হইতে একখানা কাগজের টুকরা বাহির করিয়া ফুলের নিকট রাখিল। বিশ্বেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, অগ্রসর হইয়া বলিল, "ও কি, সাবিত্রী ?"

"আপনার সেই টাকা। দিদি বল্লেন, আমাদের এ টাকার কোন দরকার নেই। আমাদের চেয়েও যারা গরিব, তাদের দেবেন, তারা কত আশীর্ব্বাদ কর্‌বে। আমাদের কোন দরকার নেই।"

বিশ্বেশ্বর স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; ক্ষণকাল পরে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় মৃদু স্বরে বলিল, "তোমার মা ? তিনি কি বল্লেন ?"

"তিনি মনে কষ্ট পাবেন বলে দিদি আমায় বল্‌তেই দেননি।"

"মনে কষ্ট পাবেন ! না, না, তা কেন হবে ! আমি তাঁকে নিজেই বল্‌ব। তিনি অবশ্য নেবেন।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সাবিত্রী বলিল, "তা করবেন্ না। দিদি যখন বলেছেন, মা নেবেন না, তখন তিনি নিশ্চয়ই নেবেন না। মা দিদির কথামতই চলেন। তা হলে আপনি আরও বেশী কষ্ট পাবেন। এ টাকা রাখুন, আমি ত বলেছিলুম, আমাদের এত বেশী অভাব নয় !" মহাভারত-বর্ণিতা সন্ন্যাসিনী অথচ গৌরবিনী রাজকন্যার ন্যায়ই সাবিত্রী চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর মুহ্যমান ভাবে সেইখানে বসিয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সম্ভ্রান্ত বা ভদ্র গৃহস্থ পরিবার যদি কালবশে দরিদ্র হইয়া যায় ত তাহাদের সেই কষ্টের উপর আত্মসম্মানজ্ঞানজনিত অত্যধিক অভিমানই সমধিক কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবস্থা স্বচ্ছল থাকিলে অপরের যে উপকার মানুষ সচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারে, অবস্থার ব্যতিক্রমে সে উপকার শেলের মতই যেন অঙ্গে বিঁধে। যেথানে অত্যন্ত বেদনা, মনোযোগ সেইখানেই অধিক। লোকে তাহা না বুঝিয়া হয় ত এ ভাবটাকে অহঙ্কার বলিয়া মনে করিতে পারে। সত্যই এ অভিমান! কিন্তু এ অভিমান মানুষের উপর নহে, ভগবানের উপর।

শীত সায়াহ্নের ম্লান আলো দরিদ্রের অঙ্গনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। সংস্কার-অভাবে রান্নাঘরখানা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ইটের ঘরগুলা অস্থিপঞ্জর বাহির করিয়া যেন মূর্ত্তিমান দারিদ্র্যেরই সাক্ষ্য দিতেছে। তথাপি অঙ্গনটুকু পরিষ্কার, তুলসী-তলাটি নিকানো-মুছানো। গাছপালাগুলি সযত্ন-রক্ষিত। দরিদ্রতা-রাক্ষসীকে ঢাকিবার জন্য চারিধারেই একটা অশ্রান্ত চেষ্টার সুস্পষ্ট প্রমাণ পড়িয়া রহিয়াছে।

কালীপদ বাহিরে খেলা করিতে গিয়াছে। কয়খানি বস্ত্র ক্ষার দ্বারা সিদ্ধ করিয়া, কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া সতী তাহা বাঁশের উপর টাঙ্গাইয়া দিতেছে; সাবিত্রী কয়েকখানা শুষ্ক ঘুঁটে লইয়া গোয়াল-ঘরে উত্তাপের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করিতেছে, ধূমে ক্ষুদ্র অঙ্গন পরিপূর্ণ। জাহ্নবী তুলসীতলায় একটি ক্ষুদ্র দীপ রাখিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ।

চিন্তা-জ্বরে তিনি অবিশ্রাম দগ্ধ হইতেছেন। কন্যারা তাহা বুঝিত, বুঝিয়াও তবু ভাবিত, মার ব্যারাম হইয়াছে,—তাই ঔষধ-পাঁচার জোগাড় করিত, জাহ্নবী শুধু নীরবে থাকিতেন।

কালীপদ ছুটিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল, "মা, আমার লজনচুস্!" তিনি তখন ঠাকুর প্রণাম করিতে ছিলেন, হাত দিয়া তাহাকে একটু ঠেলিয়া বলিলেন, "তোমার দিদির কাছে যাও।" সাবিত্রী ডাকিল, "আয় রে কালি! ক্ষান্ত পিসীকে দিদি তোর লজনচুস আনতে দিয়েছে। সে এল বলে।"

ভগ্নীর ক্রোড়ে উঠিয়া বালক বলিল, "আজ যদি না পাই ত তোমায় খুব মার্‌ব। উঁ—!" ভ্রাতার অঙ্গের ধূলা মুছাইয়া দিতে দিতে সাবিত্রী বলিল, "পাবে বই কি! হ্যাঁ রে, জামা গায়ে দিস্‌নি যে?"

"যে সব ছেঁড়া জামা—ও জামা বুঝি মানুষে পরে। বিপিন কত ঠাট্টা করে। ও আর আমি পর্‌ব না।"

"এই ত্থাখ্, দিদি শেলাই করে ভাল করে দিয়েছে।"

বালক জামাটা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া ভূমিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল, "এই বুঝি ভাল? ও ত শেলাই করা। ও আমি পর্‌ব না।"

"লক্ষ্মী ভাইটি আমার! ত্থাখ্ দেখি; শীতে তোর হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে—শীতও কি লাগে না। পর্, এখন ত বিপিন এসে ঠাট্টা কর্‌তে পার্‌বে না,—ঘরে পর্‌বি কে দেখবে?"

বালক কোনমতেই সে প্রবোধে ভুলিল না, হাত পা ছুড়িয়া সাবিত্রীকে অস্থির করিয়া তুলিল। তখন জাহ্নবী ধীরে ধীরে আসিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অঞ্চলে ঢাকিয়া

গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন, সাবিত্রীও চক্ষু মুছিয়া কার্য্যান্তরে গেল,—সতী, লম্বিত বস্ত্রের অন্তরালে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্ষান্ত বাগদির মেয়ে এবং তাহাদের অত্যন্ত অনুগত। তাহাদের কাটা পৈতা, দড়ি, গাছের ফলটা-মূলটা লইয়া সে ই হাটে যাইত এবং বিনিময়ে চাউলাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনিয়া আনিয়া দিত। আপনার দুঃখের ন্যায় ভটচাযদের দুঃখেও সে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই ভাবেই সে চলিত। এই কারণে তাহাদের দৈন্যের কথাও সকলে তেমন প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারিত না।

মাথায় একটা ধামা লইয়া ক্ষান্ত তখন গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "সতী মা।" তাহার কণ্ঠের ধ্বনি পাইয়া কালি ছুটিয়া বাহিরে আসিল— "দিদি আমার লজন্দুস?"

"এই যে দাদা, তোমার লটনচুসি না এনে কি থাকতে পারি? এই ন্যাও—"বলিয়া সে একটা কাগজের মোড়ক বালকের হাতে দিল। বালক মহানন্দে "ওমা মা—ন্যাখ, ন্যাখ" বলিতে বলিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সতী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ধামা রাখিয়া ক্ষান্ত বলিল, "শীতে ঠাউরে মরেছিনু। হ্যাঁরে আগুন করেছিস্?"

"না।"

"তা আলোটা আন্ না বাছা। সাবি কোথা রে? আলোটা আন্।"

সাবিত্রী ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া বলিল, "তেল এনেছ, দাও পিদিমটা জেলে আনি।"

"আমারও যেমন দশা, মা! না পারি হাঁটতে, রাস্ত হয়ে

গেল। আর হাট কি এখানে, বাছা! তা ছাখ্ তোদের এখনো টাটকা চোখ আছে, এই ত সন্ধ্যে, আমি এখনি আঁধার দেখছি। এই ন্যাও বাছা, তেলের শিশি! চার পয়সার তেল ছাখ, এ রাজ্যেতে কি আর বাস করা চলে? যেমন চাল আক্রা, তেমনি তেল আক্রা! সব মুখপোড়া মিন্‌সের এক হাঁক।"

সতী মৃদু স্বরে বলিল, "থালাখানায় কত হল?"

ক্ষান্ত প্রায় কাঁদিয়া উঠিল। "সে কথা আর বলুনি, মা, বলুনি! অমন বগী থালাখানা কি না মিন্‌সেরা একটা টাকাতেও নিতে চায় না। কেন্‌বার সময় কোন্ না তিনটে টাকা নেগেছিল। মিন্‌সেরা ডাকাত মা, ডাকাত।"

সতী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "পুরোনো জিনিষে তাই হয়, পিসী। তা কত দিলে?"

"এক টাকার কমে ছাড়িনি, মা। আট আনা খোকার এই কাপড় খানায় লাগল। আর চালে ডালে নুনে আট আনা,—হিসেব করে ন্যাও দেখি। পাট কিনে আনতে আর পয়সায় কুলোল না। আর বারের দড়ি বিক্রীর আট আনায় সবই চাল কিনে এনেছিনু, পাট কিনতে কুলোয়নি, এবারও হল না। তা হ্যাঁ গা, পাট কেনা তুলো কেনার কি হবে? ঘরকন্নার সব বাসন কখানাই কি এমনি করে যাবে?"

"বাসনই বা আর কই? ও কখানা না হলে সংসারও চল্‌বে না—জানি না, কি হবে।"

সাবিত্রী দ্রব্যাদি সব ঘরে তুলিল। গৃহ হইতে দুইটা পক্ক কদলী আনিয়া ক্ষান্তকে দিয়া বলিল, "গাছের কলা পিসী, খেয়ে দেখিস।"

ক্ষান্ত রাগিয়া বলিল "রাখ্, রাখ্, তোর দিদি খাবে, মায়েরা খাবে। বামুনের ঘরের "ক্ষ্যাড়" পিরথিমীর সবব জিনিষে বঞ্চিৎ। ঐ সবই হল গে, তানাদের রাহার।"

"না পিসী, তুমি নাও, আরও আছে।" সতীও অনুরোধ করিল। অগত্যা ক্ষান্ত বাক্যে ক্ষান্তি দিয়া, কলা দুইটা, ও ঘুঁটে করিয়া গোয়াল-ঘর হইতে একটু আগুন লইয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতে কালিপদ সঙ্গী বালকদের গৃহে খিচুড়ী দেখিতে পাইয়া গৃহে আসিয়া মহা ধূম বাধাইল, "আমি খিচুড়ী খাব।" সাবিত্রী কাতর কণ্ঠে মাতাকে বলিল, "মা ডাল নেই ত।" সতী বলিল, "তুই চুপ কর্। আমি তোর খিচুড়ী রেঁধে দেব, কালী।"

আহারের সময় হরিদ্রারঞ্জিত অন্ন দেখিয়া বালক প্রথমে প্রতারিত হইল, শেষে বুঝিয়া সব ছড়াইয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইল। সতী নীরবে এক ধারে সরিয়া গেল। যেখানে স্বামীর শয্যা পাতা থাকিত, জাহ্নবী সেইখানে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া রহিলেন। কেবল সাবিত্রী এই দুর্দ্দান্ত বালককে নানা প্রকার প্রলোভনে শান্ত করিবার জন্য বিফল চেষ্টা পাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ কাঁদিয়া কাটিয়া শ্রান্ত বালক ঘুমাইয়া পড়িল। পাছে সে জাগিয়া আবার কাঁদে বলিয়া রোয়াক হইতে কেহ আর তাহাকে তুলিল না। সতী অনেকক্ষণ পরে স্নান করিয়া আসিল। সাবিত্রী উঠানের শাক-পাতা তুলিয়া একটা ব্যঞ্জনের জোগাড় করিয়া দিল। জেঠাইমা হরিনাম সারিয়া, গাভীকে বহু গালাগালি দিয়া দুধটুকু দুহিয়া আনিলেন। সতী বলিল, "সাবি,

ছাখ্ত, গুড়ের ভাঁড়ে কি গুড় আছে, তা হলে হুধে হুটো ভাত দিয়ে একটু গুড় মেখে পায়েসের মত করে রাখি। কালী যে কেঁদে ঘুমিয়েছে, খায়ওনি—পায়েস পেলে খুশী হয়ে খাবে'খন।"

জ্যেঠাইমা চেঁচাইয়া উঠিলেন, "তোদের সব নবাবী! গরিবের আবার অত বড়মানুষি কেন! খায় খাবে, না খায়, অমনি থাকবে। পেটে জ্বালা ধরলে আপনি খাবে। গুড়টো নষ্ট না করলে নয়?" জ্যেঠাইমার তিরস্কার তাহাদের সহিয়া গিয়াছিল। তাই কেহ বিচলিত হইল না। সাবিত্রী ভাঁড় দেখিয়া বলিল, "না দিদি, গুড় নেই।"

"থাকবে কি! যে সব অলক্ষ্মী! ঘরে কি জিনিষ দাঁড়াতে পায়! অ মা! এমন সংসারও ত দেখিনি!"

একে সংসারের কষ্ট, তাহার উপর বাক্য-যন্ত্রণা, একেবারে মণিকাঞ্চন-যোগ! সতী নীরবে রন্ধন সারিয়া মাতাকে ডাকিতে গেল দেখিয়া জ্যেঠাইমা অগত্যা বকিতে বকিতে একটু গুড় বাহির করিয়া আনিয়া বলিলেন, "এই নে, ছেলেটা নেহাৎ খেতে পাবে না,—তাই না থাকলেও নেই বলতে পারিনে। সেদিন জলটুকু খেয়ে গুড়টুকু রেখে দিছলুম। এ সংসারে কি কিছু থাকার জো আছে!"

সতী জাহ্নবীকে গিয়া ডাকিল, "মা ওঠ, খেতে চল।" জাহ্নবী মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "আমার, বোধ হয়, জ্বর এসেছে। তোমরা খাওগে, দিদিকে দাওগে—আমি আজ আর খাব না।"

সতী মাতার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "এ রকম জ্বর ত মা, রোজই হয়! না খেলে ক'দিন বাঁচবে? যা পার, খাবে চল!"

"না মা, আমি খাব না।"

সতী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এর পরে ত কপালে উপোস আছেই মা, আগে থেকেই কেন না খেয়ে শুকুবে!"

জাহ্নবী অগত্যা উঠিয়া গিয়া আহারে বসিলেন। যদিও তিনি কিছু দেখেন না, তথাপি কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত সংবাদই রাখেন। তিনি বুঝিতেছিলেন, এ ভাবে আর বেশীদিন চলা দুর্ঘট। বিষম চিন্তাভারে সত্যই তাঁহার প্রত্যহ জ্বর আসিত।

ঘরের আহার্য্য অল্প যাহা-কিছু ছিল, দুই দিনেই তাহা ফুরাইয়া গেল। সংসারে খাইতে চারিটি লোক, অথচ কোন উপার্জ্জন নাই। সকালে উঠিয়া কালী বলিল, "মা, ক্ষিদে পেয়েছে,—খেতে দে।"

মা বলিয়া সে ডাকিল, কিন্তু দাঁড়াইল গিয়া, দিদির নিকট। সতী নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার হাত পা উঠিতেছিল না।

বালক তখন ডাকিল, "দিদি ওঠ্ না, ভাত চড়াবি নে?" দিদি উঠিল না দেখিয়া বালক মায়ের নিকট নালিশ করিতে গেল। সতী তখন মৃদু স্বরে সাবিত্রীকে বলিল, "ছাখ্ দেখি, টেকোয় কি একটুও তুলো নেই?"

"না, দিদি।"

"সাবি—তবে আজ উপোস! কালীকে কি খেতে দি? আজ আবার হাট-বার নয়, নইলে ক্ষান্ত পিসীকে দিয়ে ঘটিটা পাঠাতুম। কি করি সাবি?"

সাবিত্রী মৃদু স্বরে বলিল, "এ রকমেই বা আর কদিন চলবে, দিদি,—তার চেয়ে বিশু দাদার—" সহসা সতী উঠিয়া দাঁড়াইল, তীব্র কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ! তার চেয়ে শুকিয়ে মরাও ভাল।"

সাবিত্রী অধোবদনে রহিল, শেষে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "শুকিয়ে না

হয়, তুমি-আমি মর্‌লুম,—কিন্তু কালী আর মা? তাঁদের কি ভিক্ষা করেও বাঁচানো উচিত নয়, দিদি?"

"ভিক্ষা? হ্যাঁ—কিন্তু আরও দুদিন পরে। যেদিন একেবারে গাছতলায় দাঁড়াব, তখন সকলের কাছেই আঁচল পাততে পারা যাবে। তুই ঘটিটা আন্, আমি একবার ক্ষান্ত পিসীর কাছে যাই।"

সহসা সাবিত্রী উচ্চ কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, "দাদা—দিদি, দাদা।"

মস্তকে টেরি, হাতে ছড়ি, সুসজ্জিত বেশে হরি আসিয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া বলিল, "তোরা কি করছিস্ রে?" "দাদা" বলিয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। সতী কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

"কি হয়েছে? কাঁদিস কেন? মা ভাল আছে?"

সাবিত্রী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আছেন। তুমি কি, তা একবার কি ভাব দাদা? তোমার কালী আজ খেতে পায় নি। মা এত ভেবে আর বেশী দিন বাঁচেন কি না সন্দেহ! আমাদের দশা কি তুমি একবার ভাব না?"

"তা আমি কি করব? বাবা কি পয়সা খরচ করে আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে গিয়েছেন, তাই সকলকে পুষব? আমি নিজের বুদ্ধিতে নিজে করে খাচ্চি, নইলে আমারও এই দশা হত। এই নে, দশটা টাকা আমার কাছে আছে, দিচ্চি! আমি তোদের তেমন ভাই নই।"

সাবিত্রী টাকা কুড়াইয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ কর দাদা, আমি বড় দুষ্ট, বড় খারাপ হয়েছি—"বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভ্রাতা বলিল, "নে, নে, কাঁদতে হবে না। আমি এখন চললুম। পারি ত ও মাসে আর একবার আসব। এ বাড়ীতে কি দাঁড়ানো যায়?"

"মার সঙ্গে দেখা করে যাও।"

"দেখা করে আর কি হবে! এসেছিলুম, বলিস্।"

হরি চলিয়া গেল। সাবিত্রী বলিল, "দিদি ওঠ! ক্ষ্যান্ত পিসীকে ডেকে আনি, সে বাজার করে এনে দিক।"

সতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ, উঠি! ছাখ্‌ সাবি, আপনার চেয়ে পরই ভাল, কিন্তু তবু পরের কাছেই লজ্জা, আপনার লোকের কাছে লজ্জা নেই!"

সতী এখন কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইল। কষ্টে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না, কেবল যখন তাহা প্রাণঘাতীরূপে দাঁড়ায়, তখনি তাহারা শুধু কষ্ট অনুভব করে। শাক, ভাত, এবং অক্লান্ত পরিশ্রম;—এসকল তাহারা নিতান্ত স্বচ্ছন্দতার সহিতই গ্রহণ করিত।

এবার তাহারা কয়েক টাকার বেশী করিয়া পাট, তুলা প্রভৃতি কিনিয়া লইল, সংসারের যাহা নহিলে নয়, তাহাই কেবল ক্রয় করিল। কালীপদর জামার কথা তাহারা ভুলে নাই, তাহাও একটা কিনিতে হইল। পরদিন একটু প্রত্যূষে ক্ষান্ত আসিয়া সতীকে বলিল, "আজকে বাবুদের বাড়ী শাক বেচ্‌তে গিয়েছিলুম, তা তেনাদের মেয়ে কোমোলা শ্বশুর ঘর থেকে এসেছে। তোমায় একবার অিশ্চি করে যেতে বলেছে। না গেলে বড্ড দুঃখ কর্‌বে, বল্‌লে।"

সতী দেখিল, কমলা এখনও তাহাকে ভুলে নাই। একটু

হাসি আসিল,—তাহা সুখের কি দুঃখের, বলা যায় না। দ্বিপ্রহরে গেলে অনেক ক্ষণ বসিতে হইবে এবং কাযেরও ক্ষতি' হইবে! তাই সতী মাকে বলিল, "মা, আমি এখনি একবার দেখা করে আসি।"

মা বলিলেন, "যাও।"

সতীকে দেখিবামাত্র কমলা পূর্ব্বের মতই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, সহর্ষ কণ্ঠে বলিল, "সতি! ভাই! আমায় ভুলে যাস্‌নি ত? এক একবার মনে কর্‌তিস্‌?"

সতী তাহার পানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। এই কি সেই কমলা? দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহার অঙ্গে সুখ-সৌভাগ্য ঝলমল্‌ করিত, সে এখন এমন শীর্ণকায়া, ম্লান-মুখী! এ যেন 'সে কমলাই নহে!' সতী বলিল, "কমলা, এমন হয়ে গেছ, ভাই? কোনো কি অসুখ করেছে?"

"অসুখ?" কমলা হাসিল। বলিল, "আমার কথা ছেড়ে দে। আমার কথা বলছিস্‌,—তোর দশার কাছে আমার কথা! আমি তোর বিয়েও দেখে যাইনি, একেবারে এই দশা দেখ্‌ছি।"

"আমার আবার দশা কি, ভাই? আমি যেমন ছিলুম, তেমনিই আছি।"

"তা বলতে পারিস্‌ বটে! শুনেছি,' তুই বিয়ের সময় ভিন্ন আর দেখিস্‌নি; তা হলেই বা কি হয়, ভাই!"

বাধা দিয়া সতী বলিল, "ও কথা ছেড়ে দাও। তোমার কি হয়েছে, বল। তোমার তেমন হাসিমুখ নেই, কেন?"

"তুই আমারই কথা আন্‌ছিস, আমি কেবল তোর দিকে চেয়ে দেখ্‌ছি। সতি, দেখ্‌তে সত্যি তুই তেমনি আছিস্‌ বটে, কিন্তু

তোর এ বেশ দেখে আমার চোখ বুজ্‌তে ইচ্ছে করছে। ভাই, কি পাপে আমাদের এমন দশা ?"

কমলা সতীর গলা ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইল। সতী নীরবে প্রস্তর-পুত্তলির মত বসিয়া রহিল। ক্রমে সুস্থ হইয়া কমলা মুখ তুলিল। সতী বলিল, "পোষ মাসে যে তারা আস্‌তে দিলে ?"

"দু বছর আসিনি, দেখ্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হল, তাই এলুম। তা ছাড়া এলেই হল, গেলেই হল, কেই বা বারণ কর্‌বে ?"

"কেন, স্বামী ?"

কমলা আবার হাসিল। সে হাসি সতীর বড় করুণ বোধ হইল।

কমলা হাসিয়া বলিল, "স্বামী ? আমি তাঁর কে যে, বারণ করবেন বা আমার খোঁজ রাখ্‌বেন ! ভাই, মেয়েমানুষ আর ফুলের মালা সমান। বাসি হলেই মাটীতে গড়াগড়ি ! আমাদের আদর ক' দিন ?"

সতী নত মুখে বসিয়া রহিল। কমলা বলিতে লাগিল, "কিছুরি স্বাদ জানিস্‌ না, এ এক রকম বেশ আছিস,—কিন্তু এ বড় জ্বালা, সতী। এখন আমি তোর আমার তুলনা করে বুঝেছি, কেবল দুঃখভোগের জন্যই মেয়েমানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সুখ তাদের জন্য নয় ! তারা যেন সে আশাও না করে।"

সতীর মনে পড়িল, একদিন সে কি কাযের জন্য বাহিরের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কালীকে ডাকিতেছিল, এমন সময় জমিদার নরেন ভাদুড়ীকে ঘোড়ায় চড়িয়া সেই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া সে সরিয়া আসে,—কিন্তু নরেনের একটা তীক্ষ্ণ কদর্য্য দৃষ্টি দেখিয়া তাহার অত্যন্ত বিরক্তি ধরিয়াছিল। আজ সে কথা

তাহার মনে পড়িল এবং মনে হইল, সত্যই কমলার সুখ জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ গল্পের পর সতী বলিল, "তবে এই বার উঠি ভাই ?"

"বোস্ আর একটু, আবার কবে দেখা হবে কি না হবে, তারও ঠিক নেই।" সতী একটু শিহরিয়া বলিল, "কেন, ভাই, অমন অলুক্ষণে কথা বল! এলেই দেখা হবে।"

কমলা হাসিয়া বলিল, "আমি মরব, বলিনি, তেমন ভাগ্য আর আমার নয়। এই ত এসে দেখ্‌ছি, তোর বাবা নেই, তুই বিধবা, আবার এসে আরও কিছু দেখ্‌তে পারি।" সতীও একটু তাচ্ছল্যের হাসি হাসিল।

আর একটু বসিয়াই সতী বিদায় লইল। কমলার কথা চিন্তা করিতে করিতে ভারাক্রান্ত চিত্তে সে বাটী ফিরিল। বামে বক্সীদের বেড়, দক্ষিণে বাঁশঝাড়, বৃক্ষচ্ছায়ায় শীতের তীক্ষ্ণ বায়ু যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। সতী অন্য মনে নত নেত্রে চলিয়াছে, সহসা সম্মুখে কে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল, "কে,— সতী ?"

সতী মাথা তুলিয়া দেখিল, বিশ্বেশ্বর।

সঙ্কুচিতভাবে মাথার কাপড় আর একটু টানিয়া দিয়া সতী পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। ইচ্ছা, বিশ্বেশ্বর পথ-পার্শ্ব হইতে সরিয়া গেলে সে অগ্রসর হইবে। বিশ্বেশ্বর সরিয়া গেল বটে, কিন্তু অগ্রসর হইল না, অস্পষ্টভাবে গলাটা একবার ঝাড়িয়া দুই একবার ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "সতি! আমি তোমার সম্পর্কে ভাই হই, আমি যদি তোমার সঙ্গে কথা কই, সেটা কি দোষের হয় ?"

সতী কোন উত্তর দিল না। বিরক্তি, লজ্জা, ভয়, এমনই অনেকগুলা ভাব এক সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর আবার বলিল, "বোনের সঙ্গে কথা কইলে কি দোষ হয় ?"

সতী এইবার চেষ্টা করিয়া দ্রুত কণ্ঠে বলিল, "কি বলবেন, শীগ্‌গির বলুন।"

বিশ্বেশ্বর মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার মাকে প্রণাম করেছিলুম, তুমি তা ফেরত পাঠিয়েছ ?"

"দরকার হয়নি, তাই ফেরত পাঠিয়েছি।"

"দরকার নাই হোক্‌, তবু যদি কেউ ভক্তি বা স্নেহ জানায়, তা কি লোকে ফিরিয়ে দেয়, সতী ?"

সতী একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তারপর তীব্র কণ্ঠে বলিল, "যারা নেবার উপযুক্ত লোক, তারা নিতে পারে,—কেন না, তাদের অভাব নেই। আর তাদের বোধ হয়, আপনি ও রকম ভাবে প্রণামও করতে যান্ না! আমরা গরিব জেনেই আপনি ও রকম সাহায্য করতে গেছলেন। আমরা গরিব সত্য, কিন্তু ভেবে দেখুন, যতক্ষণ আমরা নিজে চালাতে পারব, ততক্ষণ কেন পরের ভিক্ষে নেব ?"

বিশ্বেশ্বর বহুক্ষণ নীরবে রহিল। সতীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "আমায় মাপ করো, আমি তোমাদের ভিক্ষা দিতে যাইনি। বিশ্বাস কর, আমি—আমি কেবল তোমাদের স্নেহ—"

বাধা দিয়া সতী বলিল, "আপনিও আমায় মাপ করবেন। আপনার মত দয়ালু লোককে আমি কঠিন কথা বলেছি।

কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, আপনার কর্ত্তব্য আপনি করেছেন, আমার কর্ত্তব্যও আমি কল্লেছি। ভগবান এখনো এক রকমে আমাদের দিন চালাচ্চেন, যেদিন আর চলবে না, সেদিন শুধু আপনি কেন, সকলের কাছেই আমাদের হাত পাততে হবে।"

"আমায় মাপ কর, সতি! আমি তোমাদের বোনের মত ভেবেই এ কাজ করেছিলুম।"

"তা আমি বুঝেছি।"

তার পর আর একটু অগ্রসর হইয়া সতী একবার বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া ঈষৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "আপনি বোধ হয়, আমাদের অবস্থার কথা মধ্যে মধ্যে ভাবেন, কিন্তু তা ভেবে মন খারাপ করবেন না। পরশু দাদা এসেছিলেন,—তিনি এখন চাকরি কর্‌ছেন, বোধ হয়। তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন, সে মানুষ হলে আমাদের আর কোন কষ্ট থাক্‌বে না।"

"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ কচ্চি, সে মানুষের মত হোক্! তোমরা আর না কষ্ট পাও! তার মতিগতি তা হলে এখন ভাল হয়েছে! শুনে বড় সুখী হলুম। সতি, সরলভাবেই আমি বলছি, তোমার ব্যবহারে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম, কিন্তু এখন আর তা মনে থাক্‌বে না! তুমিও রাখ্‌বে না?"

"না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

মাঘ মাসটা জাহ্নবী কোনরূপে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলেন, কিন্তু ফাল্গুনের প্রথমেই তাঁহাকে একেবারে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল। অসুস্থ দেহে নীরবে দুর্দ্দান্ত শীত উপেক্ষা করিয়া কাটাইয়া দিয়া শেষকালে আর তিনি পারিয়া উঠিলেন না। মাতার এই নির্জ্জীব ভাব দেখিয়া সতীর চক্ষে অন্ধকার নামিল।

দরিদ্রের গৃহে চিকিৎসার তেমন ধূম নাই, তথাপি তাহাদের সাধ্যমত চিকিৎসা চলিতে লাগিল। হারাণ ডাক্তার ভিজিট এবং ঔষধের দরুণ কয়েক টাকার বিল পাঠাইল। তাহা পরিশোধ করিতে সংসারে যেটুকুও বা সচ্ছলতা সতী আনিতে পারিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। আবার সেই দারিদ্র্য রাহু আসিয়া সংসার গ্রাস করিল। জাহ্নবী কন্যাদের পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন, "আমি ভাল হই ত এমনি ভাল হব, এই অবস্থায় কেন তোরা এত খরচ করছিস্?" সময় সময় তিনি সংসারের খোঁজ লইতেন, তাহারা কোন কষ্ট পাইতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেন। সতী বলিত, "মা তুমি অত ভেবো না, তা হলে সারতে পারবে না। চিরকাল যে রকমে আমাদের দিন কাটছে, সেই রকমেই কাটবে। দাদা বাড়ী এলেই আর অভাব থাকবে না, এ দুদিন না হয় একটু কষ্ট হলই।"

জাহ্নবী ভাবিয়া বলিলেন, "তবে হরির কাছে একবার খবর পাঠা।"

"পাঠিয়েছি, দুদিন পরেই দাদা আসবে।"

সতী মাতার কাছে বলিতে পারিল না যে, যাহাকে সে পাঠাইয়াছিল, তাহাকে কটূক্তি করিয়া হরি ফিরাইয়া দিয়াছে! ক্রমশঃই সে অধঃপাতে যাইতেছে! তথাপি সে মনে করিল, আর একবার দাদাকে ডাকিতে পাঠাইবে। আবার অনেক করুণ কথা শিখাইয়া কালিপদকে সঙ্গে দিয়া ক্ষান্ত পিসীকে সে চাঁদপুরে পাঠাইল। কয়েক ঘণ্টা পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, হরিবাবু কলিকাতায় গিয়াছেন। সতী নীরবে অশ্রু মুছিল।

সংসারে অবশিষ্ট যাহা কিছু তৈজস-পত্র ছিল, ক্ষান্ত গিয়া একে একে সে সমস্ত হাটে বেচিয়া আসিতে লাগিল এবং তাহাতেই রোগীর পথ্য এবং সংসার খরচ একরূপ চলিতে লাগিল। তথাপি তাহারা কাহারও নিকট হাত পাতিতে পারিল না, বা দুরবস্থার কথা মুখ ফুটিয়া জানাইতে পারিল না। আপনাদের অবস্থা-জনিত সঙ্কোচে তাহারা কাহারো বড়ো যাইত না, কাজেই তাহাদের বাড়ীতেও বড় কেহ আসিত না। সেই জন্য তাহাদের বাড়ীর খবরও বড় কেহ জানিত না।

যতদূর সম্ভব টানিয়া সতী সংসার চালাইত। পাছে কালীকে কষ্ট পাইতে হয় বলিয়া তাহাকে একটু স্বচ্ছন্দে রাখিয়া গোপনে দুই ভগিনী প্রায় অর্দ্ধোপবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তথাপি বেশী দিন আর এভাবে চালাইয়া উঠা গেল না।

চৈত্রের শেষ হইয়া আসিতেছে। রোগিনী এখন অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। সংসারের এমন অবস্থা-সত্ত্বেও সতী যেন অন্ধকারে কূল দেখিতে পাইল। আবার ভাবিল, রোগের কবল হইতে মুক্ত হইয়া মাতাকে হয় ত সে অনাহারে প্রাণত্যাগ

করিতে হইবে। যুক্ত করে আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে সতী শেষ-রাত্রে মাতার শয্যাপার্শ্বেই ঘুমাইয়া পড়িল। অতি প্রত্যূষে জাহ্নবী সতীকে ডাকিলেন, "সতি! সতি! ওঠ্।" ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "কেন মা? কি হয়েছে?"

"কিছু হয়নি। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে মনটা কেমন খারাপ হয়েছে, বুকে একটু হাত বুলো।"

সতী মাতার বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিল। কন্যার বিশুষ্ক ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া জাহ্নবী বলিলেন, "মা, বিপদে অধীর হয়ো না। ভগবান চিরদিন সমান রাখেন না, বিপদে পড়লে তাঁকে ডেকো, অবিশ্যি কূল দেবেন।"

সতী ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "এ কথা এখন কেন বল্‌ছ, মা?"

"কি জানি, প্রাণের মধ্যে যেন কেমন কর্‌ছে।"

সাবিত্রী উঠিল। মায়ের পায়ের কাছে একটু বসিয়া গৃহকার্য্যে সে প্রস্থান করিল। কালিপদ উঠিয়া এক চোট খেলা করিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, কি খাব?"

কালিকার শেষ সম্বল দুটি চাউল, আপনার অসুখ বলিয়া না খাইয়া, ভ্রাতার জন্য অতি যত্নে সতী বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই চাউল কয়টি ভাজিয়া আনিয়া তাহাতে একটু নুন মাখাইয়া সে ভ্রাতাকে দিল। ছোট ধামিটি লইয়া খাইতে খাইতে কালিপদ বাহিরে চলিয়া গেল। সতী মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার তেষ্টা পেয়েছে?"

"না।"

"হ্যাঁ মা, পেয়েছে। উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আহ্নিক সেরে নাও। নিয়ে কিছু খাও।"

জাহ্নবী একবার কন্যার প্রতি চাহিলেন, মৃদু স্বরে বলিলেন, "মা, আমি এক রকম করে বাঁচ্‌বই, এ কঠিন প্রাণ সহজে বেরুবে না, কিন্তু আমার সামনে কালী কি তোমরা যেন অনাহারে শুকিয়ো না। আমি না খেলেও বাঁচ্‌ব।"

সতী সে কথা কানে না তুলিয়া মাতাকে মুখ-হাত ধোয়াইয়া কাপড় ছাড়াইয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল। জ্যেঠাইমা গরুর দুধটুকু দুহিয়া দিয়া বকিতে বকিতে নদী-স্নানে বাহির হইলেন। সতী ভাবিয়াছিল, আজ আর সে দ্বার খুলিয়া বাহির হইবে না; কিন্তু মাতার জন্য তাহা ঘটিল না। সে ভাবিল, যতক্ষণ দুধটুকু আছে, ততক্ষণ মাতাকে মরিতে দেওয়া হইবে না। সাবিত্রীকে বলিল, "সাবি, তুই উনুনটা ধরা, আমি চট্‌ করে ডুব দিয়ে আসি।"

সাবিত্রী মৃদু স্বরে বলিল, "উনুন ধরিয়ে কি হবে?"

"দুধ জ্বাল দেব।" বলিতে বলিতে একটা কলসী লইয়া সতী খিড়কীর দ্বার খুলিয়া পুকুরে চলিল।

দ্বার খুলিতেই, সে দেখিল, একখানা ভাঁজ-করা কাগজ এক টুকরা দড়ী দিয়া কে দ্বারের বাহিরে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে। কি কাগজ? একখানা চিঠির মত দেখাইতেছে না! কৌতূহলবশতঃ সতী সেখানা খুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্রই বটে! অপরিচিত হস্তের অক্ষরে তাহারি নাম উপরে লেখা রহিয়াছে!

বিস্ময়ের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল। তথাপি মাতা পিপাসিতা, সে কথা স্মরণ করিয়া চিঠিখানা ইটের পাশে গুঁজিয়া রাখিয়া সে বাহির হইল। বাটী আসিয়া ভিজা কাপড়েই

দুধটুকু জ্বাল দিয়া তাহার অর্দ্ধেকটুকু সে মাতাকে খাওয়াইল। জাহ্নবী বহু আপত্তি করিলেন, শেষে কন্যার চক্ষে জল দেখিয়া অগত্যা আর একটু ঢালিয়া রাখিয়া দুগ্ধটুকু গ্রহণ করিলেন।

সতী তখন সিক্ত বস্ত্রেই ঘাটের দিকে চলিল। পূর্ব্বদিনের উপবাসে শরীর তাহার অত্যন্ত জ্বালা করিতেছিল। তাই সিক্ত বস্ত্র সে ত্যাগ করিল না। ইটের ফাঁক হইতে পত্রখানা লইয়া প্রথম সম্বোধন পাঠ করিতেই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। শেষে অনেক চেষ্টায় ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সে পত্রখানা পড়িয়া লইল। পত্রের লেখক, নরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী জমিদার স্বয়ং, তাহার কমলার স্বামী। অতি কদর্য্য ভাষায় কদর্য্য প্রস্তাব করিয়া সে পত্র লিখিয়াছে। তাহাদের দুঃখে অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সে লিখিয়াছে, যে, তাহার প্রস্তাবে চলিলে তাহাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না। রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, পত্রখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সতী আবার জলে গিয়া নামিল; পত্রখানা পড়িয়া যেন কোন অপবিত্র দ্রব্য সে স্পর্শ করিয়াছে, তাই পুনঃ-পুনঃ ডুব দিয়া অনেক ক্ষণ জলে পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া সে বাড়ী গেল। সাবিত্রী বলিল, "দিদি আবার নাইলে? কিছুতে পা দিয়েছিলে বুঝি?"

"হ্যাঁ।" তার পর সাবিত্রীকে বলিল, "আমার বড় অসুখ করছে, আমি একটু শোব।"

সাবিত্রী শুষ্ক মুখে বলিল, "কালীকে কি খেতে দি, দিদি?"

"দুধটুকু দিস্। একটু তুই খাস্, একটু তাকে দিস্।" সতী কাপড়খানা নিঙড়াইয়া লইয়া একটা ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তাহার শরীরে তখন সত্যই অসহ্য যন্ত্রণা-বোধ হইতেছিল। পড়িয়া

থাকিতে থাকিতে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত চক্ষে নিদ্রা আসিল। সতী ঘুমাইয়া ক্ষণেকের জন্য যন্ত্রণার হাত এড়াইল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে শুনিল, ভাতের পরিবর্ত্তে দুধ পাইয়া কালিপদ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। দুধটা ফেলিয়া দিয়া সে খুব কাঁদিতেছে, সাবিত্রীও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছে। সতী অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা কর্ণকুহর রোধ করিয়া প্রস্তর-পুত্তলির মত পড়িয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বারে আঘাত পড়িল, "দিদি—দিদি, উঠে এস।" সতী উত্তর দিল না। "দিদি, উঠে এস—বিশুদাদার মাসিমা কি সব পাঠিয়েছেন, দেখ এসে।"

সতী ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার খুলিল, দেখিল, একজন ভারী এক দিকে একটা পুষ্পচন্দনশোভিত জলপূর্ণ কলসী ও অপর দিকে একটা প্রকাণ্ড সিধা লইয়া ডাকাডাকি করিতেছে। সতী ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কিসের ?"

"আজকে সংকেরাত্তি—মা ঠাকরুণের অন্নদানের বেরতো—বামুনবাড়ী দিতে হয়, তাই!"

একে একে সব নামাইয়া রাখিয়া ভারী চলিয়া গেল। সাবিত্রী ফল-মূল দিয়া কালিদাসকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সতী ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া রাঁধিতে গেল। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু অগ্নির উপর পড়িল, তাহা অগ্নির মতই দাহ-কর! সে অশ্রু ভগবান বা মনুষ্য, কাহার উদ্দেশে,—তাহা ঠিক বলা যায় না।

আবার ধীরে ধীরে দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। সতী যথাস্থানে আর একখানা পত্র পাইল, তাহা নানা প্রলোভন

পূর্ণ। চিঠিখানা পূর্ব্ব-মত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সতী নীরবে রহিল। সাবিত্রীকে এ কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না, পাছে সে ভয় পায়!

অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী এবার বৈশাখ মাসে বোধ হয় অনেক ব্রত লইয়াছিলেন। পাঁচ-সাত দিন অন্তর প্রায়ই ভোজ্যাদি, এবং জলপূর্ণ কলসী নানা ব্রতের নামে তাহাদের বাড়ী আসিতে লাগিল। সতী বুঝিল, দারিদ্র্য-দশা মৃগনাভিরই মত। সমস্ত বুঝিয়াও সে নীরবে রহিল, কেন না, এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আর যুঝিবার তাহার সাধ্য নাই। এই দিন সংসারের ভাবনা একটু দূরে সরাইয়া পাঁচটা অবান্তর বিষয় সে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু এই নিরুদ্বেগ-ভাব মুহূর্ত্তের জন্যও বোধ হয় ভাগ্য-দেবতা তাহাদের জন্য বিধান করেন নাই। সহসা একদিন তারাপুরের কুঠীর মনিব তাঁহার প্রাপ্য তিন শত ও তাহার সুদ তিন শতের তাগাদা করিয়া পাঠাইল। না দিতে পারিলে অবিলম্বে বন্ধকী বাড়ী বিক্রয় করিয়া লইবে বলিয়া শাসাইতেও ছাড়িল না।

সেদিন জাহ্নবী আর শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি না খাইলে কন্যারা কিছু খাইবে না দেখিয়া অগত্যা মুষ্টিমাত্র কিছু আহার করিয়া শয্যায় গিয়া পড়িলেন। দুর্ভাবনায় ক্ষীণ দেহে কম্প দিয়া জ্বর আসিল। সাবিত্রী ম্লান মুখে মাতার নিকট বসিয়া রহিল। সতী একটা জীর্ণ কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। ঘুমাইতে কি?

সে ভাবিতেছিল, কাহার জন্য আজ এ বিড়ম্বনা! তাহাদের

উদরের দায়ে ত এ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় নাই। শুধু তাহারই জন্য! তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দতা কিনিতে গিয়াই ত পিতা-মাতা এমন করিয়া আশ্রয়হীন হইয়াছেন! তাহাকে সুখী করিবার জন্যই না এ বিড়ম্বনা! এত দুঃখ, এত জ্বালা! কাহার নিকট হইতে এ বিপদে ভরসা পাওয়া যায়? কে এমন সময় আশ্রয় দিতে পারে! কাহাকে বলা যাইতে পারে, ওগো, আমাদের মত দীন ভিক্ষুককে তোমায় ছয় শত টাকা ঋণ দিতে হইবে! এমন কি কেহ নাই! যদি থাকে, তবু কে এমন নির্লজ্জ আছে যে, কাহারো নিকট এমন কথা বলিতে পারে! সতীর আবার মনে হইল, হয় ত বলিতে হইবে না, নিজেই সে সাহায্য করিতে আসিবে। ছি, ছি, কি হেয় জীবন! কেবল কি ভিখারীর মত তাহার দয়া আশ্রয় করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! আর কি কোন উপায় নাই?

সাবিত্রী ডাকিল, "দিদি, ঝড় এল, কাপড় কখানা তুলে আন, আমি ছোঁব না।"

সতী দ্বার খুলিয়া দেখিল, তাহারই অন্তরের ভাব অনুকরণ করিয়া প্রকৃতি যেন তুমুল বিপ্লব বাধাইবার উদ্যোগ করিয়াছে। কাপড় কয়খানা তুলিবার পর তাহার মনে পড়িল, ঘরে জল তোলা নাই, সমস্ত রাত্রি দুর্য্যোগ থামিবে না, সংস্কার-অভাবে শুষ্ক কূপও বারিহীন। কক্ষে সে কলসী তুলিয়া লইল। তাহাকে কলসী কক্ষে লইতে দেখিয়া সাবিত্রী বলিল, "জল নেই বুঝি? আনি না, দিদি।"

"তুই মার কাছে বস্। আমি এক দৌড়ে জলটা নিয়ে আসি!"

জলে নামিয়া কলসী ডুবাইয়া কক্ষে তুলিতে গিয়াই সতী সহসা

ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সম্মুখে পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া একজন লোক! কে ও? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল, সে নরেন্দ্র।

ভয়ে সে চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু কণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না! জলে দাঁড়াইয়া নীরবে তখন সে কাঁপিতে লাগিল।

নরেন হাসিয়া বলিল "ভয় কি, সুন্দরী! আমি বাঘ নই, ভাল্লুকও নই, দু-দুখানা চিঠি—তার একখানারও জবাব দিলে না যে!"

সতী সাহস সঞ্চয় করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "ভাল চান্ ত সরে যান্, এখনি যান,—না হইলে আমি চেঁচাব।"

"এ যে বোকার মত কথা বল্‌ছ! তুমি না খুব বুদ্ধিমতী! কেন, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল্‌ছ! এই দশায় ত আছ,—রাণীর মত থাক্‌বে। আমি শুনেছি, তোমাদের বাড়ী শীগগির ক্রোক্ হবে। তখন তোমরা কোথায় দাঁড়াবে? আমার কথায় রাজি হও, তোমার মা ভাই বোন কারও আর কষ্ট থাক্‌বে না।"

সতী জলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন সাক্ষাৎ যম নরেন্দ্রের রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাপিষ্ঠ আবার বলিল, "কি বল? রাস্তায় রাস্তায় মা-ভাই-বোন নিয়ে ভিক্ষে করা ভাল,—অনাহারে তাদের মৃত্যু দেখা ভাল—না, আমার কথায় রাজি হওয়া ভাল?"

সতী দুই হাতে মুখ ঢাকিল। নরেন্দ্র দেখিল, তাহার ঔষধ ক্রমে ধরিতেছে,—সোৎসাহে সে বলিল, "আমি হরির কাছে তোমাদের সব খবর রাখি। যেদিন অবধি তোমায় দেখেছি, সেই দিন থেকে তোমার কথা আমার জপ-মালা হয়ে আছে। ভাল অবস্থায় থাকলে তোমরা কিছু গ্রাহ্য কর না, তাই এত দিন

সাহস পাইনি। তুমি যদি আমার হতে চাও, তোমার আর কোন কষ্ট থাকবে না। যা চাবে, তখনি তা পাবে। এই বিপদে পড়েছ, বল, তোমার কত টাকার দরকার? এখনি তা দেব।"

সতী আর্ত্ত কণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, "তুমি যাও, যাও, শীগগির যাও, নইলে এখনি আমি জলে ঝাঁপ দেব।"

"আচ্ছা, আচ্ছা—তা এখন যাচ্চি,—কাল এ সময় আসব কি? আসব—কি বল? ঝড় আসছে, এখন তুমি বাড়ী যাও।"

সতী বলিল, "আগে তুমি যাও, তবে আমি উঠব।"

"কেন, আমি কি সাপ যে, কাছ দিয়ে গেলে ছোবল দেব? আজ তবে বিদায়।"

পাপিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। সতী কাঁপিতে কাঁপিতে জলের মধ্যেই বসিয়া পড়িল। মানবের সর্ব্বনাশী কুপ্রবৃত্তি যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার চারিদিকে কৌশল-জাল বিস্তার করিতে আসিয়াছিল। সতীর সাধ্য কি, যে তাহাকে নিবারণ করে! যেন আশে-পাশে অন্ধকারময়-দেহধারী পিশাচের দল তাহার চারি পাশে আসিয়া তাণ্ডব নৃত্য বাধাইয়াছে। ভয়ে সতী নিস্পন্দ হইয়া পড়িল, এমন তাহার সাহস নাই যে, অঙ্গুলিটি নাড়িতে পারে।

সহসা পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে সে দেখিল, কে একজন ছুটিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল, তীক্ষ্ণ নয়নে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া যেন স্তম্ভিতভাবে সে চাহিয়া রহিল, তারপর দ্রুতপদে চলিয়া গেল। সতী চিনিল, সে বিশ্বেশ্বর! বুঝিল, নরেন্দ্রকে নিশ্চয় সে পুকুরের পাড় হইতে নামিতে দেখিয়াছে। সতীর এক একবার মনে হইতেছিল, এখনই যদি সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে,

তাহা হইলে কে রক্ষা করে! কিন্তু সবলে মনকে ফিরাইয়া অধরের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া সে বাড়ী ফিরিল। আর এখন সে কম্পন নাই —তাহার সঙ্কল্প পর্ব্বতের মত দৃঢ়। তাহাকে দেখিয়া সাবিত্রী উৎকণ্ঠিত মুখে বলিল, "দিদি, এত দেরী হল যে ?"

"আমি ঘাটে যাচ্ছিলুম।"

"কাপড় ভিজেছে, পড়ে গেছলে বুঝি ?"

"হ্যাঁ।" জাহ্নবী শুনিতে পাইয়া অন্তর্ভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রভাতে জাহ্নবী সাবিত্রীকে বলিলেন, "ঝড়ে সব আমগুলো পড়ে গেছে, এই কাঁচা আম চারটে আর বেল-ফুল ক'টা বিশুর মাসীকে দিয়ে আয় ত মা।"

আম দিয়া ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী বলিল, "মা, তিনি অক্ষয় তৃতীয়ায় গঙ্গা-স্নান করতে নবদ্বীপ যাচ্চেন। বল্লেন, তোর মা ভাল থাকলে তোর মা কি দিদি যেতে পারত। মা, উনি মা, বড্ড আদর করেন, আমার ভারী লজ্জা করে।" জাহ্নবী নীরবে রহিলেন; সতী একবার ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কুঠীর সহিত কারবার, বিশ্বেশ্বর অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহাদের সহিত মতের মিল না হওয়াই ইহার কারণ। কারবার ছাড়িয়া দিয়া সে রবি শস্য ও ধানের আড়ত করিয়া এবং অনেক জমি-জমা কিনিয়া বেশ একটা ফলাও কারবার করিয়া

তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ফরাসডাঙ্গা অঞ্চল হইতে কয়েকজন তাঁতি আনাইয়া নিজের জমিতে তাহাদের ঘর-দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে দেশে স্থাপিত করিয়াছিল। তাহাদের দ্বারা তাঁত বুনাইয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া কলিকাতায় তাহার দোকানে চালান দিত। এইরূপ নানা কার্য্যে বিশ্বেশ্বর সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। অর্থের উন্নতি করিতে তাহার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কেন না, অধিক অর্থ না হইলে পশ্চিমে গিয়া যথোচিত কার্য্য সুরু করা যাইবে না।

বিশ্বেশ্বর গ্রামের লোকের দারিদ্র্যের জন্য যে একেবারে ভাবিত না, এমন নহে। তবে পল্লীগ্রামে সকলেরই একরূপ স্বচ্ছন্দে চলে দেখিয়া এবং অযাচিতভাবে সাহায্য করিতে গেলে কিরূপ লজ্জা পাইতে হয়, তাহাও সতীদের নিকট হইতে শিখিয়া সে আর গ্রামের লোকের দিকে বড় ঘেঁস দিত না। আপনার কার্য্য ও কল্পনা লইয়াই সে মত্ত থাকিত।

নবদ্বীপে মাসিমাতাকে গঙ্গাস্নান ও ঠাকুর দর্শন করাইয়া পাঁচ দিন পরে বিশ্বেশ্বর বাটী ফিরিল। বাটী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। মাসিমা রন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন, বিশ্বেশ্বর এই অবকাশে আড়ৎ ও তাঁতশালা ঘুরিয়া আসিল, দেখিল, কার্য্যে কোন বিশৃঙ্খলা নাই। আহারে বসিয়া বিশ্বেশ্বর দেখিল, অন্নপূর্ণার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর অথচ ঈষৎ করুণা-মণ্ডিত। বুঝিল, কোন কারণে তিনি বিশেষ মনঃকষ্ট পাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েচে মাসিমা?"

"কই! কিছুই ত হয়নি, বিশু" বলিয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন। নিশ্বাসটা অত্যন্ত পুরাতন। বিশ্বেশ্বর আহার করিয়া যাইতে লাগিল।

মাসিমা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে আপনা-আপনি বলিলেন, "আহা, দেখলেও দুঃখ হয়।"

"কাকে দেখলে দুঃখ হয়, মাসিমা?"

"এই ভটচাযদের মেয়েদুটোকে। এই খানিক আগে সতী আমাকে নমস্কার করতে এসেছিল।"

"সতী! তোমাকে নমস্কার করতে? কেন?"

বিশ্বেশ্বর সহসা ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া মাসিমার পানে চাহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তা এলে দোষ কি? নবদ্বীপ থেকে এসেছি, তাই বোধ হয় তার মা দেখতে পাঠিয়েছিল।"

বিশ্বেশ্বর আর কিছু বলিল না। একটু অন্যমনস্কভাবে আহার সমাধা করিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। কি একটা সমস্যার মীমাংসায় মন চঞ্চলভাবে এ দিক ও দিক করিতেছিল। অন্নপূর্ণা ডাকিয়া বলিলেন, "প্রদীপে তেল নেই হয় ত,—হাতে করে আন্ ত বাবা, জ্বেলে দি।"

"আমি এখনি শোব, আলোর দরকার নেই!" বলিয়া বিশ্বেশ্বর শুইয়া পড়িল। কুটিল তর্কটাকে 'অসম্ভব' বলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া পাশ-বালিশটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টায় পড়িয়া রহিল।

প্রত্যূষে উঠিয়া মুখে চোখে জল দিয়া প্রথমে সে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া লইল। একবার তৃষিত নেত্রে ইদানীং তাঁহার হস্ত-স্পর্শশূন্য পুস্তকরাশির পানে সে দৃক্‌পাত করিল। শয্যায় বসিয়া একবার অন্যমনস্কভাবে মস্তকের নিকটস্থ তাকের প্রথম পুস্তকখানা টানিয়া লইয়াই বিস্মিত হইয়া সে দেখিল, একখানা ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্যের উপর কে সেখানা আনিয়া রাখিয়াছে। এ

কার্য্য কখনই তাহার কৃত নয়, মাসিমাও এ ঘরে কখনও আসেন না। পুস্তকের উপরের মলাটখানাও একটু উঁচু,—যেন তাহার ভিতরে কিছু লুক্কায়িত আছে। বিশ্বেশ্বর মলাটখানা উন্টাইতেই দেখিল, একখানা চিঠি। উপরে মেয়েলি অক্ষরে লেখা, "শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মৈত্রেয়—শ্রীচরণেষু।" এ কি? এ পত্র কে লিখিল? ত্বরিত হস্তে খামখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পত্র খুলিয়া সে পাঠ করিতে লাগিল। কয়েক ছত্র পড়িয়াই সে অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িল। মনও নানা ভাবনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রথম হইতে সে পড়িতে আরম্ভ করিল।

"শতকোটী প্রণামান্তর নিবেদন, আপনি এই পত্রখানা পড়িতে গিয়া প্রথমেই হয়ত বিস্ময়ের সহিত ভাবিবেন, কে লিখিয়াছে, হয়ত নামও অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। সেই জন্য পত্রের প্রথমেই আপনাকে জানাইতেছি, আমি সতী।

অনেক কথা লিখিব বলিয়া পত্রখানা লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কি লিখি! লিখিবার অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু প্রথমে কোন্ কথা বলিয়া আরম্ভ করি! প্রথমেই কি লিখিতে কি লিখিব বলিয়া ভয়ে প্রাণ অবসন্ন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আমার আর এখন কিসের লজ্জা! যাহা কলমে আসিবে, তাহাই লিখিয়া যাই; কোন্‌টা গোড়ায়, কোন্‌টা শেষে বলিলে ভাল হয়, তাহার বিচারের চেষ্টা, আর কেন করি!

আপনাকে আমি এ পত্র লিখিতাম না, আমি যে কায আজ করিব, তাহার সাফাই গাহিয়া রাখিবার আমার কোন প্রয়োজন

ছিল না। নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণের জন্য কাহাকেও আমি কিছু বলিয়া গেলাম না; আপনিও আমার সুখ-দুঃখের এমন কোন অংশী নন যে, আপনাকে এ কথা না বলিলে চলিত না। সংসারের চক্ষে আমি দোষী, অপরাধীর বেশেই গেলাম, কিন্তু আপনার কাছে এ কথাগুলা না বলিয়া কেন যে যাইতে পারিলাম না, তাহা বুঝিতে পারি না।

পাঁচ দিন পূর্ব্বে ঝড়ের দিন বৈকালে আমাদের খিড়কীর পুকুর ঘাটের কথা আপনার মনে আছে কি? সেদিন আপনি যাহাকে যাইতে দেখিয়া ছিলেন, সে চাঁদপুরের জমিদার, নরেন ভাদুড়ী। আর পুকুর-ঘাটে জলে যে বসিয়াছিল, সে আমি। ইহা আপনি অবশ্য বুঝিয়াছেন,—কিন্তু কেন, তাহা বোধ হয়, ভাবিয়া দেখেন নাই, অথবা সকলে এরূপ দৃশ্য দেখিলে যেরূপ অর্থ ভাবিয়া লয়, তাহাই ভাবিয়া লইয়াছেন। ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, ভদ্র ঘরের মেয়ের পক্ষে এ কার্য্য সম্ভব কি না!

নিজের নির্দ্দোষিতা-প্রমাণের জন্য আমি এ পত্র লিখিতে বসি নাই। আমি দোষী! সত্যই আমি সেই পাপিষ্ঠের প্রলোভনে পতিত হইয়াছি। আমার আর সাধ্য নাই যে, এ প্রলোভন হইতে আপনাকে ফিরাই। কিন্তু শুনুন, আমি তাহাকে প্রতারণা করিয়াছি। প্রতারণা, কেন বলি—সে যাহা চাহিয়াছিল, আমি তাহার অনেক বেশী তাহাকে দিতে সম্মত হইয়াছি। সে দেহ চাহিয়াছিল, আমি তাহাকে আত্মা দান করিয়াছি। সে আমার এক জন্ম না হয় অপবিত্র করিত, নষ্ট করিত; আমি সেই মূর্ত্তিমান নরকের দ্বারপালের পায় আমার জন্ম-জন্মান্তর, ইহকাল-পরকাল

স্বর্গ-মর্ত্ত, সব দান করিয়া বসিয়াছি। আমি কি তাহাকে প্রতারণা করিলাম ?

স্পষ্ট কথায় বলি, সে আমায় অনেক টাকা দিতে চাহে। যেদিন তুমি তাহাকে দেখিয়াছ, তারপর আর একদিন, গত পরশ্ব, যে দিন চাঁদপুরের কুঠীর মহাজনেরা আমাদের বাড়ীর দ্বারে ঢেঁটরা দিয়া যায় যে, তিন দিনের মধ্যে উঠিয়া যাইতে হইবে, সেইদিন দুপুর বেলা সে আবার আসে। আমার পায়ের গোড়ায় হাজার টাকার নোট সে ফেলিয়া দেয়। আমি সে টাকা গ্রহণ করিয়াছি। আজ রাত্রে সে আসিয়া ঘাটের ধারে দাঁড়াইবে, আমি তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইব,—এইরূপ কথা আছে। আমি চলিলাম,—আজ আমি নিশ্চয়ই যাইব,—কিন্তু তাহার কাছে নয়,—আর এক জনের কাছে।

জানি না, তিনি সংসারের লোক অপেক্ষা সদয় কি নির্দ্দয়! জানি না, তিনি আমায় কি শাস্তি বিধান করিবেন। যাহাই করুন, তাঁহার হস্ত হইতেই আমি সে দণ্ড গ্রহণ করিব, সংসারের লোকের হস্ত হইতে আর নয়। আজ যদি পাপিষ্ঠ নরেন্দ্র আমায় এমন ভাবে প্রলুব্ধ না করিত, এমন করিয়া আমায় নরকের মুখে টানিয়া লইয়া না যাইত, সংসারের কষ্টে, আঘাতে জ্ঞানশূন্যা আমাকে এ সুযোগ দান না করিত, তাহা হইলে কি আমি মরিতে সাহস পাইতাম! কখনো না!

কাল আমার মা-ভাই-বোন পথে দাঁড়াইবে, ভিক্ষা করিয়া খাইবে, লোকের উপহাস সহ্য করিবে, হয়ত অনাহারে মরিবে,— আমি কি আজ তুচ্ছ নিজের মায়ায় এ লোভ সম্বরণ করিতে পারি! আমার আত্মা চিরকাল যন্ত্রণা পাইবে, এই ভয়ে আমি আত্মহত্যা

হইয়াছে। ভদ্রলোকের মেয়েরা যে কথা শুনিলে কানে আঙ্গুল দেয়, সে কথা আমি দাঁড়াইয়া শুনিয়াছি, আবার শেষে এই চাতুরীও খেলিলাম। সবই পারিলাম—কি আর বলিব! তাহার চেয়ে আত্মহত্যার ভয়াবহ স্মৃতিও আমার আদরের বলিয়া মনে হইতেছে। সকলে আমায় নিন্দে করিবে? করুক। কিন্তু তুমি করিয়ো না। একবার মনে করিয়ো তোমার পায়ে স্থান পাইলে আমার আজ এ দশা ঘটিত না—আত্ম-বিনিময়ে আমায় আজ মা-ভাই-বোনকে বিপন্মুক্ত করিতে হইত না!

মনে ভাবিয়ো না যে, অন্যের পরিগৃহীতা হইয়াও, বিধবা হইয়াও কেবল পরপুরুষকে চিন্তা করিতাম। আমরা বাঙ্গালী, হিন্দু-কন্যা, কষ্ট হইলেও আমরা দুই দিনেই নিজের অবস্থার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া লই! তোমার মাসিমার কথায়, আমার সরল বালিকা-চিত্তে যে আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, কয়েক মাসেই আবার তাহা সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছিলাম। হয় ত, কমলার মত (সে কথা তোমার মনে আছে কি?) সুখ-সৌভাগ্যের মধ্যে পড়িলে তাহারি মত সব ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটে নাই। দারিদ্র্য-দশার পাষাণ-ফলকে তোমার দয়ার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিতে চাহিত। আমি চিরদিন তাহা অন্ধকারের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। তোমার সাক্ষাতে সত্য করিয়া বলিতেছি, নিজেও কোন দিন সে মূর্ত্তি বাহির করিয়া দেখি নাই! দেখিবার অবসরও ছিল না। আজ সে অবসর মিলিয়াছে! আজ আর কোন কাজ নাই—আজ আমার বিশ্রাম। তাই বোধ হয় তুমি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছ।

মনে করিয়াছিলাম, তোমায় অনেক কঠিন কথা লিখিব,

অনেক রাগ প্রকাশ করিব, কিন্তু এখন ক্রমশই আবার মন হইতে যেন সে সব সরিয়া যাইতেছে। সংসারে কাহারো প্রতি কোন দাবী, কোন ক্ষোভ রাখি নাই, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কেন এ অভিমান আমার মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

আজ আর আমার মনে কোন অভিমান নাই। আমি বুঝিতেছি, আমি অন্যায় করিয়াছি,—কেন, তোমার নিকট সাহায্য চাহিলাম না! তোমার উপর রাগ কি সাজে? কিন্তু যাহা করিয়াছি, তাহা আর ফিরাইবার নয়। এখন বলিতেছি, আমার মা-বোনকে দেখিয়ো, কালীকে দেখিয়ো—তাহারা যেন কোন বিপদে না পড়ে। পার ত—দাদাকে সুমতি দিয়ো। আমার কেমন মনে হয়, আমি গেলেই ইহাদের সব বিপদ কাটিয়া যাইবে। তুমি মনে কিছু কষ্ট করিয়ো না। সুখী হও, পার ত, একটী ভাল পাত্রে সাবির বিবাহ দিয়ো। তবে আমি আসি! প্রণাম জানিয়ো। ইতি

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পত্র-পাঠ সমাপ্ত হইল,—তথাপি বিশ্বেশ্বর স্পন্দনহীন পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। চিন্তা করিবারও যেন তাহার ক্ষমতা ছিল না। যতক্ষণ সে চিঠিখানা পড়িতেছিল, ততক্ষণ যেন অগাধ জলে সন্তরণ-মূঢ়ের ন্যায়ই সে হাবুডুবু খাইতেছিল। এখন যেন তলাইয়া গিয়াছে, অতল সলিলে যেন তাহার সমাধি

হইতেছে। হস্ত-পদ স্থির, বলহীন, ঈষৎ সঞ্চালনেরও ক্ষমতা-রহিত, চক্ষু বিস্ফারিত, অথচ দৃষ্টি-হীন, মন অচঞ্চল, নিস্পন্দ।

সহসা কক্ষের বাহিরে অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। তিনি যেন আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিতেছেন, "বিশু! বিশ্বেশ্বর!" বিশ্বেশ্বরের উত্তর দিবার সাধ্য ছিল না।

অন্নপূর্ণা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঘরে আছিস্? গাঁয়ের খবর কিছু শুনেছিস?"

"শুনেছি।"

"এখনো দাঁড়িয়ে আছিস্ যে, তবে? যা, ছুটে যা—এখনো উপায় আছে।"

"কিসের উপায়?"

"তবে কি শুনেছিস্, বল্‌ছিস্? রামশঙ্কর ভট্টচায্‌দের বাড়ী যে মহাজনেরা দখল করেছে। আজ তিন দিন হল, না কি নোটিস্ দিয়েছিল। আমার কপাল, আমি বাড়ী ছিলেম না। এক গাঁয়ে হলেও ওদের বাড়ী এতদূর যে, কাল সন্ধ্যার সময় এসেও কোন খবর পাইনি। নিধের মা এখনি দেখে এল, মহাজন আর পেয়াদা এসে বাড়ী ঘিরেছে। এখনি হাত ধরে সব পথে বসাবে রে। যা, শীগ্‌গির যা, আমিও এখনি যাচ্চি—তুই আগে গিয়ে বাধা দি-গে যা।"

বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল, মাসিমাতার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহারও চক্ষে জল আসিল। মনে হইল, হয়ত এখনো কোন উপায় করা যায়! সতী—হয় ত এখনো তাহাকে বাঁচাইতে পারা যায়,—বিশ্বেশ্বর উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

গিয়া সে দেখিল, ভট্টচায্‌দের ভগ্ন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া

প্রতিবেশীবর্গ দিব্য জটলা বাধাইয়াছে। মহাজন এবং পেয়াদারা বাটীতে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছে। ভিতর হইতে রোদন ধ্বনি উঠিয়াছে,—অসহায় প্রতিবেশীরা দিব্য আমোদ পাইয়াছে, বলিতেছেন, এত যাদের অহঙ্কার, তাদের ত এ দশা ঘট্‌বেই!—কেন, আমরা পাড়া-প্রতিবেশী, এ কথা একবার আমাদের জানাতে নেই, না, বলে কিছু চাইতে নেই? গরীবের এত তেজ কেন! বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া একজন বলিলেন, "কি বল হে, ছোক্‌রা? আমাদের এখন আর হাত কি, এঁ্যা? আর এ ভদ্রলোকই বা নিজের পাওনা-গণ্ডা ছাড়্‌বে কেন? এতে কান্নাকাটি না করে বেরিয়ে আসাই ভাল।" বিশ্বেশ্বর সে কথার কোন উত্তর দিল না। এ রোদন-ধ্বনি যেন তাহার কানে অন্যরূপ শুনাইল। তাহাকে সবেগে দ্বারাভিমুখে যাইতে দেখিয়া মহাজন একটু সম্ভ্রমের সহিত সরিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদারাও পথ দিল।

যে কক্ষ হইতে রোদন-ধ্বনি নির্গত হইতেছিল, অঙ্গন পার হইয়া বিশ্বেশ্বর সেই কক্ষাভিমুখে ছুটিল। গিয়া দেখিল, জ্যেঠাইমা দ্বারের নিকট বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন, কক্ষের মধ্যে সাবিত্রী ও কালী মাটীতে লুটাইয়া-লুটাইয়া অব্যক্ত কণ্ঠে কাঁদিতেছে; জাহ্নবী নীরবে কাহাকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। বিশ্বেশ্বর গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "সতি!" সকলে চাহিয়া দেখিল। বালক কালী চেঁচাইয়া উঠিল, "ও বিশুবাবু, আমার দিদি—আমার দিদি?" বিশ্বেশ্বর বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "কি হয়েছে?"

"জানিনে, বিশুবাবু, দিদি কথা কচ্চে না। জ্যেঠাইমা বল্‌ছে, দিদি মরে গিয়েছে।"

বিশ্বেশ্বর সেই খানে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, সবলে জাহ্নবীকে সরাইতে যাইবামাত্র জাহ্নবীর কণ্ঠে স্বর ফুটিল। আর্ত্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কে রে পাষাণ, সর্, সর্, এখন নয়। আর একটু পরে। আমি আপনিই ছেড়ে দেব, এখন আমায় খানিকটে বুকে নিয়ে রাখতে দে।"

"মা, আমি—আমি বিশু। আমায় একবার দেখ্‌তে দিন। যদি এখনো বাঁচাতে পারা যায়—" জাহ্নবী চোখ মেলিয়া চাহিলেন। দ্বিগুণ আর্ত্ত কণ্ঠে বলিলেন, "কে এসেছ, বাবা? বিশ্বেশ্বর? আমার সতীকে কি পায়ে স্থান দিতে এসেছ? আমার সতীর কি আজ বিয়ে? মরণাপন্ন বুড়োর সঙ্গে তার কি আমি বিয়ে দিই নি? সতী কি আমার বিষ খেয়ে মরেনি? আমি কি স্বপন দেখ্‌ছিলুম! এস বাবা, এস।"

বিশ্বেশ্বর অতি কষ্টে জাহ্নবীকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া দিয়া দেখিল, সতী উপুড় হইয়া শুইয়া দুই হাতের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে স্পর্শ করিতে বিশ্বেশ্বরের সহসা সাহস হইল না। যেন সে কি মহা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, যোগে নিমগ্ন,—সে যোগ ভঙ্গ করিতে গেলে অপরাধীকে তখনি যেন ভস্মীভূত হইতে হইবে! বিশ্বেশ্বরের সঙ্কোচ দেখিয়া, সাবিত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল, দুই হাতে সতীকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তিত করাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেখুন, দেখ্‌বার আর কিছু নেই! দিদি অনেকক্ষণ চলে গেছে।"

তথাপি বিশ্বেশ্বরের মনে হইতেছিল, হয়ত এখনো সতী বাঁচিয়া

আছে! শীতল নাসারন্ধ্রে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া দেখিল, কালিমা-বেষ্টিত নিমীলিত চক্ষু টানিয়া টানিয়া দেখিল, মুখের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া জিহ্বার উত্তাপ অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু না,—কিছু নাই!

"সব ঠাণ্ডা! কিছু নেই—"

"বিশ্বেশ্বর! কেন বাবা, মিথ্যে চেষ্টা কর্‌চ! আমার সতী' ত ঢলাঢলি কর্‌বার মেয়ে নয়। যতদিন সে কষ্ট সয়ে বেঁচেছিল, কারুকে একবারও সে কষ্ট জান্‌তে দেয়নি। আজ আর না সইতে পেরে চলে গেছে, তাও তাকে একবার থাক্‌তে বল্‌বার সময়ও কাউকে দিলে না। এখন আমায় খানিকটা ছেড়ে দাও! মা আমার জ্বলে জ্বলে এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, সতীর আমার ঠাণ্ডা শরীর, ঠাণ্ডা বুকটা আমি এখন খানিক ক্ষণ বুকে করে নিয়ে থাকি,—দাও। সতী আমার এমন নিশ্চিতি হয়ে ত একদিন একদণ্ডও ঘুমুতে পায়নি! সুস্থ শরীরে, সুস্থ মনে সতী আমার ঘুমুচ্ছে, আমি তাই খানিক চেয়ে চেয়ে দেখি।"

ক্রমে লোকে ঘর পুরিয়া গেল। "এ কি সর্ব্বনাশ!" "কেন এমন হল?" "কিসে মল?" "কি খেয়ে?" "বিষ কোথায় পেলে?" "কি দুঃখে বিষ খেলে?" "কেউ কিছু বলেছিল?" ইত্যাদি প্রশ্নে বাটী মুখরিত হইয়া উঠিল। লোকের কোলাহলে ও উৎসাহ-সূচক আন্দোলনে জ্যেঠাইমা পর্য্যন্ত থামিয়া গেলেন। অনুসন্ধিৎসু পরোপকারী মাতব্বরগণ নানারূপ ঘোঁট করিতে লাগিলেন। সন্ধান করিতে সতীর শিয়র হইতে একটা মালিশের ঔষধের শিশি, ও এক টুকরা কাগজ বাহির হইল। কাগজে লেখা ছিল, "আমি স্ব-ইচ্ছায় আত্মহত্যা করিলাম। আমার

মা ভাই কিম্বা কোন আত্মীয়-স্বজন ইহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। ইতি সতী।"

বাহির হইতে মহাজনের লোক আসিয়া বলিল, "তবে বাবু আপনারা সব রইলেন, বাড়ীতে আজ বিপদ, আমরা যাচ্ছি,—কাল কিন্তু আমরা ফির্‌ব না।"

কেহ কোন কথা কহিল না। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল, অন্নপূর্ণা বসিয়া নীরবে জাহ্নবীকে শুশ্রূষা করিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে এক একবার সতীর ললাট-বক্ষ স্পর্শ করিয়া দেখিতেছেন। তিনি বিশ্বেশ্বরকে নিকটে ডাকিয়া আঁচল হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "ওদের বিদেয় করে দাও। কাল আর যেন ওরা না আসে।"

বিশ্বেশ্বর বাহিরে গিয়া নিভৃতে মহাজনের সঙ্গে হিসাব মিটাইয়া ফেলিল। মহাজন একে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে বাধ্য-বাধকতায় আবদ্ধ, তাহাতে তাহার খরচা-সমেত সাতশত টাকার উপরও লভ্য হইয়াছে, নীরবে সে মর্টগেজ কাগজখানায় উশুল দিয়া সেখানি বিশ্বেশ্বরের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। বিশ্বেশ্বর সেখানা আপনার নিকট রাখিয়া দিল।

তাহাকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সকলে প্রশ্ন বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। লোকটা ভদ্র—এখন কিছুদিন স্থগিত রাখিয়া চলিয়া গেল—এই বলিয়া বিশ্বেশ্বর তাহাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করিল। নিরাশ হইয়া অগত্যা সকলে বলিল, "এখন এ দিকের কি হয়? দারোগাকে খবর না দিলে ত চল্‌বে না, আমরা অনেকক্ষণ খবর পাঠিয়েছি—তিনি এলেন বলে। তারাপুরের বড় ডাক্তারও এল বলে।" বিশ্বেশ্বর নীরবে রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ও দারোগা একসঙ্গে আসিলেন। বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া উভয়কে তাঁহারা সাদর সম্ভাষণ করিলেন, বিশ্বেশ্বরও শুষ্ক মুখে প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার নীরবে মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল, দারোগা মালিশের শিশি, ও কাগজের টুকরা লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল, সতীর শান্ত, নিদ্রাচ্ছন্ন মুখ যেন লজ্জায় ঘৃণায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিতেছে, প্রশান্ত শুভ্র ক্ষুদ্র ললাটে আশঙ্কার নীল বর্ণ রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিতেছে, লজ্জা-নিবারণের জন্য সতী যেন অন্তরে অন্তরে ভগবানকে ডাকিতেছে। বিশ্বেশ্বর অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের নিকট আসিয়া মৃদু স্বরে অনেক কথা বলিলেন। বিশ্বেশ্বর কেবল শুনিয়া যাইতে লাগিল, কথা কহিতে বা কোন যুক্তি করিতে তাহার কোন শক্তিই ছিল না। ডাক্তার ডাকিল, "বিশ্বেশ্বর বাবু—" বিশ্বেশ্বর নিকটে গেল।

"রোগী অনেকক্ষণ মরিয়াছে। দেখিতেছি, বেলেডোনাযুক্ত মালিশেই মৃত্যু ঘটিয়াছে। দেখা যাইতেছে, ইহা আত্মহত্যা।"

দারোগা বলিলেন, "এ মালিশ কার ডিস্পেন্সারীর ? হারাণচন্দ্র নাগের—দেখছি, কি করে এল।"

জ্যেঠাইমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বৌয়ের মাজার বেদনার জন্যে ওটা আনা হয়েছিল। ব্যথা ভাল হয়ে যাওয়ায় বেশী আর খরচ হয়নি—সবটাই প্রায় ছিল।"

বিশ্বেশ্বর বুঝিল, বুঝিয়া ডাক্তার ও দারোগার মুখের পানে চাহিল। ডাক্তার তখন বিশ্বেশ্বরের পরামর্শ চাহিল। বলিল, "হস্‌পিটালে লইয়া যাওয়াই আমার কর্ত্তব্য—এখন আপনি কি বলেন ?"

বিশ্বেশ্বর শিহরিয়া উঠিল, মৃদু স্বরে বলিল, "যদি অন্য কিছু উপায় থাকে, বলুন, আমার যতদূর সাধ্য আপনাদের সন্তুষ্ট করব। আমার নিজের বাড়ীর ব্যাপার বলেই জানবেন। আপনি কি এ বিপদে সাহায্য করবেন না ?"

"আমার কোন আপত্তি নেই। আমি এখনি স্বাভাবিক মৃত্যু বলে রিপোর্ট লিখ্‌তে রাজী আছি। আপনি দারোগাকে হাত করুন।"

দারোগাকে হস্তগত করিতে বিশ্বেশ্বরের অধিক সময় লাগিল না। তখন কলেরা রোগে স্বাভাবিক মৃত্যু লিখিয়া লইয়া ডাক্তার ও দারোগা প্রস্থান করিলেন। গ্রামের লোকও অগত্যা নিরাশ-চিত্তে নানাপ্রকার জল্পনা করিতে করিতে গৃহে চলিল। কেহ কেহ বা নিতান্ত নাচার হইয়া আপনার সাধুতা জাহির করিবার জন্য বিশ্বেশ্বরের বহু প্রশংসা করিয়া নিজের হাতে এখন কিছু না থাকার যথেষ্ট প্রমাণ দিতে লাগিল। হাতে কিছু থাকিলে তাহারা কি আর এতক্ষণ নীরবে থাকিত ? ডাক্তার ও দারোগাকে নজর পাঠাইয়া দিয়া সমস্তই পরিষ্কার করিয়া ফেলিত, লোকেও এ কেলেঙ্কারীর কথা জানিতে পারিত না। কেহ বা বলিল, "ওর মাসিরই এ সব খরচ—ও কিপ্‌টে বেটার আর এত করতে হয় না, মাসি মাগী লোক ভাল।" কেহ বা আরও কিছু ভাবিয়া লইয়া পরম গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিল। সকলেই এখন গৃহাভিমুখে ছুটিল, কেন না এবার মড়া ফেলিবার পালা।

বিশ্বেশ্বর তাহার কর্ম্মচারী নিবারণ চাটুয্যে, হরিশ গাঙ্গুলি, ও চির-উপকার-বদ্ধ রামতনু সান্যাল এই তিন জনকে ডাকিয়া লইয়া আসিল; তাহাদিগকে অঙ্গনে দাঁড় করাইয়া গৃহের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণার মু:খর পানে চাহিয়া এক পার্শ্বে সে নীরবে দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা বুঝিলেন—গম্ভীর খেদপূর্ণ স্বরে জাহ্নবীকে বলিলেন, "বৌ, তোমার সতীকে যে তার বাপের কোলে দিয়ে আসতে হবে। আমরা ত' তার কষ্ট একদিনও ঘুচোতে পারিনি, তাই সে বাপের কাছে যাচ্চে। মেয়ে ত' চিরদিনই পরের ঘরে যায়, বৌ! সতীকে তার স্বামীর কাছে—"

"ও কথা বলো না দিদি, ও কথা বলো না। সতী আমার কুমারী। আমি কি তার বিয়ে দিয়েছি? সেই ঘাটের মড়া কি তার বর? আমার কুমারী মেয়ে তাঁর কোলে যাচ্চে। সতীর এ থান কাপড় ছাড়িয়ে দাও, দিদি! ছোটবেলার সেই নীলাম্বরীখানি পরিয়ে দাও, যে কাপড় পরে তাঁর হাত ধরে সে বেড়িয়ে বেড়াত। কাঁচের কালো চুড়ি কগাছি পরিয়ে দাও, বিধবার বেশে আমার সতীকে যেতে দিতে পারব না, তিনি আমায় কি বলবেন—"

অন্নপূর্ণা দেখিলেন, প্রবোধ দেওয়া মিথ্যা। সাবিত্রীকে বলিলেন, "সাবিত্রী, মাকে এসে ধর।" সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া সতীর মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিল। আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "অমন কথা বলো না, পিসিমা। আমার দিদি কোথায় যাবে? আমার দিদি ত' কোথাও যায় না। আজ কেন সে যাবে? আমাদের ফেলে সে কেন যাবে?"

অনেকক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কি করছ মা! যে গেছে, সে ত গেছেই, এদের ত বাঁচাতে হবে! ওদের ডাকো।"

জাহ্নবী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সাবিত্রীকে একদিকে সরাইয়া দিলেন।

সতীর মৃত দেহ কোলে টানিয়া লইয়া, একবার স্থির চক্ষে কন্যার মৃত্যুচ্ছায়া-ঘন মুখের পানে চাহিলেন, শীতল গণ্ডে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা! সতী! তবে এস মা,—আমার কাছে বড় কষ্ট পেয়েছ। তাঁর কোলে গিয়ে সেই ছোট সতীটি হয়ে ঘুমোওগে। যদি একবার মা বলে শেষবার ডেকে যেতে মা! কাল রাত্রে যখন পায়ের তলায় শুয়ে পায়ে হাত বুলিয়েছিলে, তখন জানিনি যে তুমি বিদায় নিচ্চ; তা হলে একবার মা বলে ডাকতে বলতুম। মা, নিতান্তই তবে আজ চল্লে? এস মা, এস। বিশ্বেশ্বর! এই নাও, সতীকে নাও।"

জাহ্নবী যেন যথার্থই বিশ্বেশ্বরের চরণে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া সবলে দুই হস্তে তাহার ক্ষীণ দেহ ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন। তিনজন ব্রাহ্মণ অমনি তাঁহার হস্ত হইতে সতীর দেহ টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিল। বিশ্বেশ্বরও নীরবে অনুসরণ করিল। সাবিত্রী ছুটিয়া আসিয়া পাগলিনীর মত তাহার পায়ে আছড়াইয়া পড়িল। আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকিল, "বিশু দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি, আমার দিদিকে নিয়ে যেয়ো না, ফিরিয়ে দিতে বল। ওগো, তোমার কি দয়া নেই? দাও আমার দিদিকে, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও গো।"

বিশ্বেশ্বর আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, "মাসিমা।"

অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া সাবিত্রীকে জোর করিয়া গৃহমধ্যে টানিয়া লইয়া গেলেন। জোর করিয়া জাহ্নবীর ক্রোড়ে তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, "বৌ, এটাকে ধর্, ওর সঙ্গে এটাও যায় যে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে যে—বড় বৌ, একটু জল দে, পাখাখানা আমায় দে ত, কালী।"

জাহ্নবী সাবিত্রীকে ক্রোড়ে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন, "সাবি, —সাবি।"

"মা—দিদি—দিদি—দিদি!"

কালীপদকে লইয়া বিশ্বেশ্বর নীরবে শববাহীদের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে গেল। সতীর ক্ষীণ দেহ দুইজন ব্রাহ্মণেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিল। সেখানে চিতা সাজাইয়া শবকে স্নান করাইয়া নব বস্ত্র পরাইয়া, কালিপদর দ্বারা মুখে ও চিতায় অগ্নি সংযোগ করান হইল। বৃদ্ধ রামতনু কালীকে দূরে লইয়া নানা প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বর নীরবে একটা বৃক্ষকাণ্ডে হেলান দিয়া বসিয়া দেখিতেছিল,—সতীর বক্ষপঞ্জর হইতে অগ্নির শিখা উত্থিত হইয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছে,—হু-হু-হু! ধূ-ধূ-ধূ!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অন্নপূর্ণা জাহ্নবীকে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। জাহ্নবী শুনিলেন না, বলিলেন, "থাক্ দিদি, এই বাড়ীতে তিনি গেছেন, সতী গেছে, সতী আমায় ঘরে পড়ে একা মা বলে কাঁদ্‌বে, আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাব না।" অগত্যা অন্নপূর্ণাকে কয়েক দিন ধরিয়া রাত্রে তাহাদের নিকটে থাকিতে হইল, কেন না, জ্যেঠাইমা তাঁহার বহুদিনলুপ্তসম্বন্ধ এক ভগিনীপুত্রের বাটীতে চলিয়া গিয়াছেন। প্রাণের কাছে মান-অপমান কিছুই নাই! তাঁহার বিশ্বাস, তিনি ঘুমাইলেই সতী তাঁহার

ঘাড় মটকাইবে। সতী যে বাড়ীতে প্রেতিনী হইয়া ঘুরিতেছে না, এ কথা, ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আসিয়া বলিলেও তাঁহার প্রত্যয় হইবে না। চিরানুগত ক্ষান্ত বাগ্দিনীও তাহাদের আগলাইবার জন্য সেই বাড়ীতে পড়িয়া থাকিত।

চতুর্থ দিবসে কালীপদ যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিল। জাহ্নবীর অনুরোধে সতীর সপত্নীপুত্রকে সংবাদ ও অর্থ প্রেরণ করিয়া বিশ্বেশ্বর কালীর দ্বারা সতীর শ্রাদ্ধ করাইলেন। জাহ্নবীর বিশ্বাস, নহিলে সতীর তৃপ্তি হইবে না।

এ কয়দিন বিশ্বেশ্বর যেন উদ্‌ভ্রান্তভাবে কাটাইতেছিল। দারুণ দুর্ঘটনায়, অপ্রত্যাশিত বিপদে লোকের হৃদয় যেমন বিকল হইয়া যায়, তাহারও সেইরূপ হইয়াছিল। সহসা একদিন তাহার মনে পড়িল, সাবিত্রীর নিকট হইতে সতীর শোণিতাপ্লুত নোটগুলা চাহিয়া লইয়া সেই পাপিষ্ঠকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। সেই ঘৃণিত অর্থ, সাবিত্রীর নিকট যেন বেশী দিন না থাকে। সাবিত্রী জানে না, সে অর্থের মূল্য কি! বিশ্বেশ্বর নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিল ; দূরস্থিত শ্মশানের দিকে একবার চকিতের মত চাহিল, বোধ হইল, যেন সেই অনির্ব্বাণ বৈশ্বানর নিষ্করুণ জগৎকে শুনাইয়া এখনও হুঙ্কার ছাড়িতেছে, এখনো সতী যেন সেই চিতার অনলে পুড়িতে পুড়িতে নিশ্বাস ফেলিতেছে, হু হু হু!

সভয়ে বিশ্বেশ্বর নদীতীর ত্যাগ করিয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। অনেকক্ষণ গ্রামের পথে পথে সে ঘুরিয়া বেড়াইল।

বাবুদের বাড়ীর উদ্যানে সেদিন বিষম বৈঠক বসিয়াছিল। শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত চত্বরে বসিয়া তাঁহারা দশমীর চন্দ্রালোক ও পুষ্পের স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত বায়ু উপভোগ করিতে করিতে যাঁহা,

তবলা ও হারমোনিয়ম্ বেহালা লইয়া গান বাজনা করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, পৃথিবী এমন সৌন্দর্য্যময়ী, তবু মানুষের এত দুঃখ কেন? কেহ সুখের সপ্ত সমুদ্রে সাঁতার দিতেছে, কেহ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে,—কেন? কেহ কাহারো পানে চাহে না, কেন? দুঃখ বোঝে না. কেন? তবে পৃথিবীর এ আনন্দ, উল্লাস, শোভা, ঐশ্বর্য্য, সবই পৈশাচিক হাসি! অন্তরস্থ দৈন্য ঢাকিবার জন্যই ধরণীর এ কৃত্রিম শোভা! নিষ্ফল, একান্তই নিষ্ফল। গীতবাদ্য তাহার ভাল লাগিল না,—সে ফিরিয়া চলিল। দূরে—যেখানে বাদ্যের উৎকট ধ্বনি মস্তকে পীড়া না দেয়, এরূপ স্থলে উপস্থিত হইতেই দূরাগত বেহালার সুরের সঙ্গে একটা করুণ সুর তাহার কানে বড় মিষ্ট লাগিল। দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া সে শুনিবার চেষ্টা করিল—গান স্পষ্টই বুঝা গেল। কে গাহিতেছে,

"আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল,
সকলি ফুরায়ে যায় মা।
জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা।"

বিশ্বেশ্বরের মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। কে এ গান গায়! এমন উৎসবের রাত্রে এমন খেদের গান, কেন গায়? - যে গাহিতেছে, সে কি বুঝিতেছে—যে তাহার গানের সুরে কত অশরীরি আত্মা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পৃথিবীকে শুনাইতেছে,

"এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,
এ পৃথিবী ভাল বাসিতে চাহে না,

যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা।”

এতক্ষণে বিশ্বেশ্বরের চক্ষে জল আসিল। সত্যই এ অকরুণ পৃথিবীতে ভালবাসা আছে কি? কে কাহার পায়ে জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরবে ঝরিয়া যাইতেছে, কে সে সংবাদ রাখে! সতী যে এমন করিয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিল, বিশ্বেশ্বর কি তাহার কোন খবর রাখিত! আবার এই যে তাহাকে নমস্কার করিয়া নীরবে সে পৃথিবী হইতে সরিয়া গেল! তথাপি তাহার আত্মা কি সে বাঞ্ছিত বস্তু পাইয়াছে? এই যে করুণার সমবেদনায় তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে, সে কি ইহাই চাহিয়াছিল? এই কি সেই ভালবাসা? যদি এমনি সুশীলা, ধৈর্য্যময়ী সুন্দরী, অনাহারে, কষ্টে, ভাবনায়, পৃথিবীর কুৎসিত ব্যবহারে, আর একজনকে নীরবে ভালবাসিয়া এইরূপে প্রাণত্যাগ করিত, তবে সেও কি এইরূপে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত? দারুণ ব্যথা কি হৃদয় মধ্যে সে অনুভব করিত না? সামান্য একখানা পুস্তক পড়িয়া হৃদয় ব্যথায় আকুল হইয়া উঠে; আর এমন বাস্তব করুণ দৃশ্যে কাঁদিবে না, এমন নির্দ্দয় কে আছে? এই কি পৃথিবীর ভালবাসা! সত্যই কি তবে পৃথিবীতে ভালবাসা নাই?

গান তখনও চলিয়াছিল;—

“বড় জ্বালা পেয়ে বাসনা ত্যজেছি,
বড় দাগা পেয়ে কামনা ভুলেছি,
অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না,
বুক ফেটে ভেঙ্গে যায় মা।

স্বরগ হইতে জ্বালার জগতে,
কোলে তুলে নিতে আয় মা।"

বিশ্বেশ্বর অস্ফুট স্বরে একবার বলিল, "বেশ করেছ সতি! এ জগতের হাত ত এড়াইয়াছ "

গান থামিয়া গেল। তথাপি সেই করুণ সুর যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। ক্রমশঃ অসহ্য হওয়ায় বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। খানিকটা পথ আসিয়া সে দেখিল, সম্মুখে ভট্টাচার্য্যদের ভগ্ন-দ্বার-পথে শ্রীহীন অঙ্গন-গৃহ অম্লান চন্দ্র-করে যেন বিধবার মতই পড়িয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সে অঙ্গন-মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া কে সেইখানে নতজানু হইয়া জোড় হাতে বসিয়া রহিয়াছে। কে ও! সতী? সেই রকমই ত! সেই রুক্ষ চুলের রাশি, সেই ক্ষীণ তনু, অর্দ্ধ-মলিন ছিন্ন বাস, সেই অবনত ম্লান পাণ্ডুর আভাযুক্ত মুখ! বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা হইল, একবার "সতী" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া ডাকে, কিন্তু কণ্ঠ দিয়া স্বর বাহির হইল না। শুধু সে নীরবে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যে তুলসীতলায় বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বিশ্বেশ্বরকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্মিত মৃদু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কে?" বিশ্বেশ্বর বুঝিল, সে সতী নয়, সাবিত্রী।

"কে, বিশুদাদা? আপনি এসেছেন? মাকে কি ডাক্‌ব?"

সাবিত্রীর করুণ ক্ষীণ স্বরে আবার বিশ্বেশ্বরের চোখে জল আসিল। মৃদু স্বরে সে বলিল, "না, তোমার সঙ্গেই আমার একটা কথা আছে, শোন।"

সাবিত্রী নীরবে চাহিয়া রহিল।

"তোমার দিদি কি তোমায় কিছু দিয়ে গিয়েছেন?"

"হ্যাঁ! অনেকগুলো নোট! তিনি নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।"

"সেগুলো সব আছে? খরচ কর নি?"

"না।"

"সেগুলো সব আমায় এনে দাও।"

সাবিত্রী কক্ষ-মধ্যে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে এক তাড়া নোট আনিয়া নীরবে সে বিশ্বেশ্বরের হস্তে দিল। সে নোট হস্তে লইতেও বিশ্বেশ্বরের হৃদয় বিচলিত হইতেছিল, কিন্তু পাছে সাবিত্রী কিছু মনে করে ভাবিয়া সে লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ নোটের কথা তোমার মা কিছু জানেন?"

"না, একদিন বল্‌ব ভেবেছিলুম।"

"না বলেছ ত' আর বলো না। যার নোট তোমার দিদি কুড়িয়ে পেয়েছিল, তাকে আমি ফিরিয়ে দেব।" সাবিত্রী নীরবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। বিশ্বেশ্বর তাহার মাসিমার নিকট শুনিয়াছিল, সাবিত্রী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সে ওঠে না, খায় না, কাহারও সহিত কথা কহে না, জাহ্নবীও তাহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না। বিশ্বেশ্বরের তাহার সহিত দুই-একটা কথা কহিতে ইচ্ছা হইল, উদ্দেশ্য, তাহাকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ওখানে বসে কি করছিলে, সাবিত্রী?"

"তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়েছিলাম।"

"আমি দেখ্‌লাম, জোড় হাতে যেন কি বল্‌ছিলে।"

সাবিত্রী নত মস্তকে মৃদু স্বরে বলিল, "শুনেছি, আত্মহত্যা কর্‌লে অগতি হয়, তাই ঠাকুর তলায় প্রদীপ দিয়ে—" বলিতে বলিতে সাবিত্রীর স্বর বাধিয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরের চক্ষেও বালিকার ন্যায় অশ্রু-প্রবাহ ছুটিল। অনেকক্ষণ পরে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সে বলিল, "তোমার দিদি স্বর্গে গিয়েছে, সাবিত্রি। তার মত পুণ্যবতীর কি অগতি হতে পারে? তোমার কি এ কথা বিশ্বাস হয়?"

"আপনি বল্‌ছেন, দিদি স্বর্গে গিয়েছে! স্বস্তিতে আছে, ভাল আছে?"

"হ্যাঁ।"

সাবিত্রী নতজানু হইয়া বিশ্বেশ্বরের পদতলে প্রণাম করিল। তার পর দাঁড়াইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "আর তবে আমি কাঁদব না। আমাদের ছেড়ে গেছে, ভুলে গেছে, তাতে আর বেশী দুঃখ কি! সে ত' ভাল আছে, স্বস্তিতে আছে!"

সাবিত্রীর চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া মুক্তা-বিন্দুর ন্যায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। ব্যথিত বিশ্বেশ্বর তাহাকে সে অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে ক্লেশ বোধ করিল। হয় ত সে এখন পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিবে। ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা কই! কালী?"

"কালীকে মা ঘুম পাড়াচ্ছেন—সে কেবল 'দিদি দিদি করে কাঁদে, কিছুতে তাকে থামাতে পারা যায় না।"

"তুমিও যে বড় কাঁদ, সাবিত্রী। কাঁদলে কি আর তাকে ফিরে পাবে! ওতে কেবল মাকে কষ্ট দেওয়া হয়।" সাবিত্রী নত মস্তকে ফুঁপাইয়া উঠিল, "আমি যে দিদিকে ছেড়ে কখনও থাকিনি।"

"চিরদিনের সঙ্গীকেও লোকে ভুলে যায়, জগতের নিয়মই এই।"

"আমি এত শীগ্‌গির কি করে ভুলব? দিদির সঙ্গী কমলা দিদি আজ এসেছিল, কতদিন সে দিদির সঙ্গ-ছাড়া—তবু দিদির নাম করে কেঁদে কেঁদে সে অস্থিচর্ম্ম-সার হয়ে গিয়েছে। সেও আর বেশী দিন বাঁচবে না। তারা দিদিকে ভুল্‌তে পারেনি, আমি কি করে ভুল্‌ব?"

"কে এসেছিল! নরেন ভাদুড়ীর স্ত্রী? তাঁর বুঝি, খুব কষ্ট হয়েছে!"

তাঁর স্বামী শুনেছি ভাল লোক নন—কমলা দিদিকে খুবই কষ্ট দেন্। দিদি কেবল কমলা দিদির নাম করে চোখের জল ফেল্‌তেন, কমলা দিদিকে তিনি বড্ড ভাল বাসতেন।"

বিশ্বেশ্বরের এক অতীত দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। কমলার সহিত বিবাহের জন্য সতীর সেই দৌত্য! তাহার হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল।

জাহ্নবী কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিলেন, "সাবিত্রী! কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্ মা?"

সাবিত্রী ফিরিয়া বলিল, "বিশু দাদা।"

"বিশ্বেশ্বর! ঘরে এস, বাবা।"

বিশ্বেশ্বর নীরবে নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। জাহ্নবীর সমক্ষে তাহার যেন শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বেশীক্ষণ সে দাঁড়াইতে পারিল না; সত্বর বিদায় লইয়া সে উঠিয়া পড়িল।

অতি প্রত্যূষে সে চাঁদপুর-অভিমুখে চলিল। প্রাতর্ভ্রমণের পূর্ব্বেই নরেন্দ্রকে ধরিতে হইবে।

অচিরেই জমিদারের হৃদয়-হীন পাষাণ অট্টালিকা চক্ষের সম্মুখে পড়িল। বিশ্বেশ্বর চক্ষু নত করিয়া গেটের নিকট পৌঁছিল। বাহিরের উদ্যানেই একখানা বেঞ্চের উপর নরেন্দ্র ভাদুড়ী বসিয়া প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতেছিল। তাহার মুখখানা অত্যন্ত বিষণ্ণ, যেন সে পীড়িত। বিশ্বেশ্বর গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। জমিদার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি, মশায় ?"

"আমার নাম বিশ্বেশ্বর মৈত্রেয়। মজুতপুরে আমার বাড়ী।"

"মশায়কে দেখেছি দেখেছি, বোধ হচ্চে যেন ; বসুন।"

"দেখবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি—আপনি মজুতপুরে প্রায়ই হাওয়া খেতে যেতেন—আমি অতি সামান্য লোক, সেই সময় কখনও চোখে পড়েছি, বোধ হয়।" নরেন্দ্র একটু চঞ্চলভাবে নড়িয়া বসিল। বলিল, "মশায়ের প্রয়োজন ?"

"প্রয়োজন আছে ; একটু নির্জ্জনে বলতে চাই।"

"এ নির্জ্জন স্থানই। কি বল্‌তে চান্‌, বল্‌তে পারেন।"

বিশ্বেশ্বর ভূমিকামাত্র না করিয়া পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া নরেন্দ্রর হস্তে দিয়া বলিল, "আপনার নোট। গুনে নিন্‌, হাজার টাকাই আছে।"

নরেন্দ্র স্তম্ভিতভাবে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল, বিশ্বেশ্বরও নীরবে অন্য দিকে চাহিল। ক্ষণেক পরে নরেন্দ্র বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন ত, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"করুন।"

"আপনি এ নোট কোথায় পেলেন ?"

"যাকে দিয়েছিলেন তিনিই আমায় দিয়ে গেছেন—তিনি আমার আত্মীয়স্বরূপা।"

"তিনি? আপনাকে দিয়েছেন! মশায়, শুনেছি, তিনি নাকি মারা গেছেন?"

"মারা যাওয়া ঠিক নয়, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রকমই গুজব—তা সে আত্মহত্যার কারণ আপনি কিছু জানেন?"

"জানি বই কি! এই যে আপনার হাতের নোটগুলি,—এইগুলিই তাঁর মৃত্যুর কারণ। এইগুলি তাঁকে নিতে হয়েছিল বলেই মরে তিনি আপনার হাত এড়িয়েছেন।"

"মশায় তা হলে অনেক কথা জানেন দেখছি; তবে আর লুকো-ছাপা করব না। কিন্তু আমার প্রতি আপনি অন্যায় দোষারোপ কচ্চেন। তিনি নোট না নিলে কি আমার জোর চলত? আমি ত, আমি ত—জোর করিনি, স্ব-ইচ্ছায়—"

"চুপ্, চুপ্, চুপ কর,—তুমি পাপিষ্ঠ! বল্তে তোমার জিব কাঁপ্ছে না? কে তাকে বার বার প্রলুব্ধ কর্তে যেত? তুমি না ভদ্রলোকের ছেলে? ঘৃণ্য স্ত্রীলোক নিয়ে দিন কাটাও বলে কি নিজের মা-বোন-স্ত্রীর মুখও দেখনি? বোঝ নি, যে ভদ্রকুলের স্ত্রী এ পৈশাচিক কাজে সম্মত হতে পারে না? যে হয়, সে বড় দুঃখেই হয়। সে মা-ভাই-বোনদের রক্ষা কর্বার জন্যই পাপিষ্ঠ তোমার অর্থ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কুলটা হতে তার জন্ম নয়, তাই স্বর্গে চলে গিয়েছে। এই নাও তোমার সেই অর্থ, যে অর্থে দুঃখীর দুঃখ মোচন হয়, আর্ত্ত-আতুর প্রাণ পায়,—সেই অর্থ তোমার হাতে পড়ে একটা সাধ্বী দুঃখিনী

বালিকার প্রাণ অকালে নষ্ট করে দিলে। তোমায় ধিক্, তোমার প্রবৃত্তিকেও ধিক্! কিন্তু মনে জেনে রেখো, কুপ্রবৃত্তির বশে একটা নারী-হত্যার পাপে তুমি পাপী হয়েছ! এ জীবনে তুমি কখনও শান্তি পাবে না। চিরদিন তার নষ্ট আত্মা তোমার পেছনে ফিরবে। তোমায় অধঃপাতিত করে নরকের পথে নিয়ে যাবে! তুমি মানুষ খুন করেছ, তোমার পেছনে আত্মহত্যার প্রেত ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

নরেন্দ্র স্তম্ভিত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল! সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তাহার ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল। ভীরু পাপী সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া ভীত কণ্ঠে বলিল, "আমার এমন দোষ কি পেলেন? আমায় কি করতে বলেন? এ কাণ্ড যে হবে, আমি ত' আগে কখনো ভাবিনি। জানলে কি এমন করি?"

"ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যদি ভদ্রলোকের মেয়ের স্বভাব না বোঝ, তবে ত তুমি পশু! মা-ভাইকে মুক্ত করবার জন্য যে নিজের প্রাণ এমনভাবে নষ্ট করলে, মনে কর দেখি, তার কতখানি উঁচু প্রাণ! নরেন্দ্র! এ জন্মে কি তোমার উদ্ধার পাবার আশা আছে? কুপ্রবৃত্তিতে তুমি সাধ্বীর প্রাণ নষ্ট করেছ! কি পাপিষ্ঠ, তুমি!"

নরেন্দ্র নীরবে রহিল। এ কয়দিন সে প্রতারিত হইয়া পরে সতীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া নীরবে কিঞ্চিৎ অনুতাপ ভোগ করিতেছিল। অনুতাপের মাত্রা এইবার পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর আবার বলিল, "শুনেছি, হরি তোমার আশ্রয়ে বাবুগিরি করে বেড়ায়। তাকে ডাকাও দেখি।"

কলের পুত্তলির মত নরেন্দ্র তাহার আজ্ঞা পালন করিল।

বাটীর দুর্ঘটনার কথা লোক-মুখে সে-ও শুনিয়াছিল,—ভীত বিষণ্ণ মুখে আসিয়া সে সেইখানে দাঁড়াইল।

বিশ্বেশ্বর তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নরেন্দ্রকে বলিল, "এটা বুঝি তোমাদের অভিনয়ে নায়িকা সাজে? একে তোমায় ত্যাগ করতে হবে। এর মা-বোন এখনো এর জন্য চোখের জল ফেলছে, সেই চোখের জল তোমার সর্ব্বনাশ আরও টেনে আনবে। এটাকে তোমার বাড়ী থেকে দূর করে দিতে হবে।"

"নিয়ে যান্, আপনি ওকে নিয়ে যান্, আমি আর থিয়েটারও রাখ্ছিনে। ঐ থিয়েটারই আমার এমন দশা করেছ, না হলে, মশায়, লোক আমি মন্দ ছিলাম না।"

"তা আমি জানি। তোমার স্ত্রী কমলা, সতী, এরা সব আমার বোনের মত ছিল। সকলের কাছেই শুনি, তোমার ব্যবহারে তোমার সাধ্বী পতিপ্রাণা স্ত্রী মরণাপন্না—সেও কোন দিন আত্মহত্যা করে তোমার পাপের নৌকা দুনো বোঝাই করে দেয়! তোমার ভরা ডুবির আর দেরী নেই।"

নরেন্দ্র অধোবদনে রহিল। বিশ্বেশ্বর হরির পানে চাহিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে তোমায় বাড়ী যেতে হবে।"

হরি একবার দীন নয়নে নরেন্দ্রর পানে চাহিল, করুণ বচনে বলিল, "নরেন বাবু, আমায় আপনি—"

নরেন্দ্র বাধা দিয়া সবেগে বলিল, "হাঁ, যাও। তোমরাই ত আমার মাথা আরও খেয়েছ; যা করেছ, খুব করেছ,—আমি আর থিয়েটার রাখ্ছি না—আমার বাড়ী থেকে চলে যাও।"

অপমানে হরির মুখ লাল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে বাহির হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর উঠিয়া বলিল, "নরেনবাবু, আমি

চললাম। বেশী আর কি বলব! যে সতীকে তুমি নাশ করেছ, সেই সতী কমলার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিল, যদি সেই সতীর ক্ষমা পেতে চাও, তবে কমলাকে সুখী করো।"

বিশ্বেশ্বর পথে আসিয়া হরিকে বলিল, "কোথায় যাচ্ছ, হরি?"

"কোথায় আর যাব! বড়লোকের আশ্রয়ে আর না—ওঁর থিয়েটারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমি এত করলাম, আর উনি কি না আজ আমায় অপমান করলেন। একবার বাড়ী গিয়ে মাকে দেখে, যে দিকে দু চোখ যায়, চলে যাব।"

"সে ভাবে কোথাও তোমায় যেতে হবে না। মাকে সুখী করে এই গ্রামেই মানুষের মত থাকতে পারবে। মোসাহেবি ছেড়ে দিয়ে ভদ্রলোকের মত কাজ-কর্ম্ম করলে তুমি অনেক লোকেরই সাহায্য পাবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভট্টাচার্য্যদের পুরাতন বাড়ীর সংস্কার ধীরে ধীরে হইয়া গেল। বাটীর বাটী-জন্ম-গ্রহণের পর রামশঙ্করের পিতা একবার কলিচূণ ফিরাইয়া ছিলেন। বহুদিন পরে তাই বুভুক্ষিত বাড়ীটা অনেক মাল-মসলা গিলিল। জাহ্নবী বিশ্বেশ্বরকে নিষেধ করিলেন। বিশ্বেশ্বর নীরবে রহিল। অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন, "তবে আর এ বাড়ীতে থেকে কাজ নেই! কোন্ দিন ঘর চাপা পড়বে! তার চেয়ে ও বাড়ী চল।" অগত্যা জাহ্নবী নীরব রহিলেন।

ভট্টাচার্য্যদের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া পাড়ার লোকে নীরবে মনের

আগুনে পুড়িতে লাগিল। বাড়ী-ঘর তাহাদের নূতন হইল, দিনও বেশ যাইতেছে, আবার হরিটাও দিব্য বাড়ী আসিয়া শান্ত শিষ্ট ছেলে হইয়াছে, বিশুর কাজ-কর্ম্ম সে দেখে শোনে। তাহার নাম করিয়া যে কেহ জাহ্নবীকে খোঁটা দিবে, সে উপায়ও আর নাই! এক উপায়, শুধু মৃতা সতীর নামে কিছু জল্পনা করা, নয় জীবিতা সাবিত্রীর নামে কোন অপবাদের সৃষ্টি করা! কেহ কেহ বলিল, "বিশ্বেশ্বর বুঝি ভটচাযদের জামাই হবে লো, তাই এত টান।" আর একজন চোখ ঠারিয়া বলিল, "ঢাক ঢোল বাজিয়ে জামাই হলেই ভাল,—গোপনে জামাই হলে যে লেঠা বিস্তর।" কিন্তু সকলে যখন শুনিল, সাবিত্রীর জন্য বিশ্বেশ্বর পাত্রানুসন্ধান করিতেছে, সম্মুখের শ্রাবণ মাসেই তাহার বিবাহ, তখন সকলে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা দেবী বিশ্বেশ্বরের উৎসাহহীন মনকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আর দেরী করো না বিশু, দেখতে দেখতে মেয়ে পনের বছরের হতে চল্‌ল; মাগী মুখে কিছু বলে না, কিন্তু হাপ্‌সে পড়েছে। পাত্রের জন্য ভাল রকম চেষ্টা কর।"

"আমি কি চেষ্টা কর্‌ছি না, মাসিমা? কিন্তু ভাল পাত্র চাই ত! অনেক খোঁজার পর আজ একখানা চিঠি পেয়েছি। পাত্রটি বিদ্বান, দু-তিনটে পাস করা, অবস্থা ঘর সবই ভাল। পাত্রের বাপ আছে। কেমন মাসিমা, এ পাত্রটি কেমন হবে?"

"শুন্‌তে ত' মন্দ বোধ হচ্ছে না, তবে বিশেষ করে খোঁজ নিয়ে কাজ করো বাপু, পরে না পস্তাতে হয়।"

"না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মাসিমা।"

"হ্যাঁরে, তা পাত্র কত টাকা পণ নেবে?"

বিশ্বেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন পাত্র কি তুমি বিনা পয়সায় পেতে চাও? টাকা কিছু লাগবে বই কি! তার জন্য ভেবো না,—বিয়ের দিন তখন শুনো। তোমার ক্যাস-বাক্সটা শুধু আমার হাতে দিয়ো।"

মাসিমা রাগিয়া বলিলেন, "যা, যা, সব তাতে তোর ছেলে-মান্ষী। মোদ্দা আর দেরী না হয় যেন।"

নিকটে বসিয়া নিধের মা পাকা আমগুলা সারি দিয়া সাজাইতেছিল। কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সে অন্নপূর্ণাকে বলিল, "হ্যাঁ মা, তা দাদাবাবুর বিয়ে কবে হবে? দাদাবাবু কি বিয়ে করবেই না?"

মাসিমা একবার বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিয়া অধোমুখে বলিলেন, "আমি তার কি জানি, মা! ভগবান জানেন, আর বিশুই জানে।"

নিধের মা বলিল, "ও মা বয়েস হলো, হোক্ ম্যানে, ভদ্দরদের ধরণই ভেন্ন।" বিশ্বেশ্বর নিধের মাকে পরিহাস করিত, কিন্তু সহসা মাসীর কাতর দৃষ্টি দেখিয়া থামিয়া গেল। পূর্ব্বে বিবাহের সম্বন্ধে কোন করুণাসূচক বাক্যে বা দৃষ্টিতে তাহার মন কিছুতেই দমিত না, কিন্তু এখন সে দেখিল, তাহার মন অতিশয় কোমল হইয়া গিয়াছে। মাসিমার বেদনা অনুভব করিয়া সহসা আজ তাহার প্রাণে ব্যথা বাজিয়া উঠিল। সে ভাবিল, কি এক সামান্য খেয়ালে মাতৃসমা স্নেহশীলার অন্তঃকরণে সে কি বিষম আঘাত দিয়াছে, ও দিতেছে। এই খেয়ালে সে-ও কি বিশেষ সুখী হইয়াছে? মাসিমাকে দুঃখ দিয়াছে বলিয়া মনে ক্ষোভ জন্মে নাই? সেই অবিমৃষ্যতার পরিণামও কি শোচনীয় হইয়াছে! বিশ্বেশ্বর সহসা যেন বুঝিল, সংসার যে নিয়মে চলিতেছে, তাহার

সহিত সেই নিয়মেই চলিতে হইবে, এক চুল এদিক ওদিক করিলে চক্রনেমিতে পিষিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু তাহা ভাবিয়া আর কায নাই। হস্তচ্যুত পাশা আবার কথনো হস্তে ফিরিয়া আসে না! এখন কেবল সেই পাশার চালেই চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে হইবে। সে চাল আর ফিরিবে না! এখন আর বিদ্রোহিতায় কোন ফল নাই। সতীর অভিশাপ বিশ্বেশ্বরের মনে পড়িল। সে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর তাহার অন্তরে মুদ্রিত আছে। সে একজনকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবে, ভালবাসিবে, সুখী হইয়া বুঝিবে, সংসারে এই আদান-প্রদানেই শ্রেষ্ঠ সুখ! না, না, তাহা হইবে না! সতীর এ অভিশাপ কথনও সফল হইতে দেওয়া হইবে না। সংসারে যতই অশান্তি জাগিয়া উঠুক, দুঃখ-বেদনা প্রকাশ পাক্, এ প্রতিজ্ঞা অটল রাখিতেই হইবে। সতী যেন তাহার কাপুরুষতায় পরলোক হইতে ব্যঙ্গের তীব্র হাসি না হাসে! তাহার অভিশাপ ব্যর্থ করিতেই হইবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই বরপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া [illegible] অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আর দেরী করা নয়। সামনে পনেরোই শ্রাবণ ভাল দিন আছে, ঐ দিনই স্থির কর।"

বিশ্বেশ্বর বলিল, "আজ ৭ই—মধ্যে কেবল সাতটা দিন—এর মধ্যে সব জোগাড় হবে, মাসিমা?"

"খুব হবে। আমি যেমন যেমন বলি, এখনি সে সব আনাতে আরম্ভ কর্ দেখি। আলিস্যি করিস্‌নে।"

বিশ্বেশ্বর কোমর বাঁধিয়া লাগিল! ভট্টাচার্য্যদের বাটীতে মস্ত একখানা চালা ঘর উঠিল,—সেইখানা বাহিরের ঘরের

কার্য্য করিবে। ভিতরের অঙ্গন পরিষ্কার করাইয়া তথায় তিন-চারিখানা চালা-ঘর তোলা হইল। অঙ্গনে বাঁশ পোঁতা হইল, পাছে বৃষ্টি হয়, সে জন্য সামিয়ানা টাঙ্গাইতে হইবে। অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণার মতই ভাণ্ডার সাজাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। জাহ্নবী কেবল নীরবে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত চাহিয়া দেখিতেন। অন্নপূর্ণা যাহা আদেশ করিতেন, তাহাই শুধু পালন করিয়া যাইতেন। সাবিত্রী অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া তাহার তুলসী-তলাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ছিল। তাহার তলায় প্রদীপ দিয়া, মাতাকে ও ভ্রাতাদের যথাসময়ে খাওয়াইয়া, সাবিত্রী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অন্নপূর্ণার সঙ্গে তাহার বিবাহের খাটুনি খাটিত। কেহ পরিহাস করিলে সে তাহা গ্রাহ্য করিত না। বাড়ীতে এখন লোকের অভাব নাই, অনেক লোক খাটিতেছে। পাড়া-প্রতিবেশীরাও সর্ব্বদা সংবাদ লইতেছে,—আসিতেছে, যাইতেছে, কুটুম্বিতা পাতাইতেছে। জ্যেঠাইমাও আসিয়াছেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সাবিত্রীর গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইল। মধ্যে বিবাহের আর একদিন মাত্র বাকী। সাবিত্রীকে আদর করি... পাড়া-প্রতিবেশীরা আইবুড়া-ভাত খাওয়াইতে আসিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে একবার নিজের বাটীতে লইয়া গিয়া উভয়ে মিলিয়া রন্ধনাদি করিলেন। বিশ্বেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তোমরা যে আজ এ বাড়ীতে, মাসিমা?"

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন, "আজ যে সাবিকে আইবুড়-ভাত দেব। দেখ দেখি, বারাণসী কাপড়খানা পরিয়ে ফুল দুটো কানে দিয়ে সাবিত্রীকে কেমন মানিয়েছে?"

বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল, এ যেন ঠিক খাপ খাইতেছে না! রুক্ষ চুলে, মলিন ছিন্ন বাসেই তাহাকে ইহার চেয়ে দেখায় ভাল। এ যেন বিলাসিতার মধ্যে আত্মসমাহিতা, উদাসিনীর মূর্তি! কি ভাবিতে ভাবিতে সে আপনার কক্ষে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে আহারের ডাক পড়িল। সে খাইতে বসিলে মাসিমা বলিলেন, "সাবিত্রী আজ নিজের আইবুড়-ভাত নিজে রেঁধেছে! এমন পাগলা মেয়েও দেখিনি। রান্না কেমন হয়েছে রে?"

"বেশ!" বিশ্বেশ্বর নীরবে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল। সাবিত্রীকে খাওয়াইয়া মাসিমা বলিলেন, "তুমি একটু শোও গে, মা। আমিও ভাত কটা সেদ্ধ করে সেরে নি।"

সাবিত্রী পাখা হাতে লইয়া মাসিমার রন্ধনের নিকট বসিল। মাসিমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আজ এ সব খাওয়া দেখতে নেই মা, আমার ঘরে গিয়ে তুমি একটু গড়াওগে। একা ত বাড়ী যেতে দেবে না, আমারও বেশী দেরী হবে না। তুমি মা, যাও।" অগত্যা সাবিত্রী উঠিয়া গেল। অন্নপূর্ণার কক্ষে গিয়া পরিহিত বস্ত্রখানা খুলিয়া ফেলিয়া নিজের সাধারণ বস্ত্রখানা সে পরিয়া লইল। ইয়ারিং দুইটা খুলিয়া বালিশের উপর রাখিল। তাহার পর অনন্যোপায় হইয়া মাসিমার শয্যাপার্শ্ব হইতে মহাভারতখানা টানিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া সে দেখিল, সম্মুখে বিশ্বেশ্বর।

বিশ্বেশ্বর নিকটে আসিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "কি দেখছিলে? মহাভারত?"

সাবিত্রী তখন শয্যা হইতে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

"তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, সাবিত্রী! জিজ্ঞাসা করব, বল্‌বে?"

সাবিত্রী নীরবে পুনর্ব্বার মস্তক আন্দোলন করিল, বলিবে।

"আমার কাছে কিছু লজ্জা করো না, আমি তোমার লজ্জা করবার কেউ নই। কথাটা বলি,—তোমার জন্য যে পাত্র স্থির করেছি, সেটি অতি সুপাত্র। তোমার কোন অমত নেই ত এতে?"

সাবিত্রী নীরবে নত মস্তকে রহিল, দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। বিশ্বেশ্বর পুনর্ব্বার বলিল, "বল, না হলে আমি অন্য কিছু ভেবে নিতে পারি। তোমার অমত আছে?"

সাবিত্রী এবার কথা কহিল, মৃদু স্বরে বলিল, "আমার অমত? এ কথা কেন বল্‌ছেন?"

"কি জানি, আমার কেমন মনে হল যে, তোমায় একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত। আমার বিশ্বাস, এ বিয়েতে তুমি ভবিষ্যতে খুব সুখী হবে। হবে না কি?"

"আমায় কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই তাই হবে।"

"আমি বল্‌ছি বলে কেন বলছ, সাবিত্রী? তোমারও কি সেই বিশ্বাস নয়?"

"হ্যাঁ! আপনি যখন সব করছেন, তখন আমার ভালর জন্যই নিশ্চয় কর্‌ছেন!"

"সত্যই তাই, সাবিত্রী! কিসে ভাল হবে, আমি কেবল সেই চিন্তা কচ্চি—সেই—"

বাধা দিয়া সাবিত্রী বলিল, "তা আমি জানি। আমি জানি, আপনি দেবতা।" বলিতে বলিতে সাবিত্রী নতজানু হইয়া

বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করিল। অপ্রতিভ হইয়া "কি কর, সাবিত্রী", বলিয়া বিশ্বেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল; গম্ভীর মুখে বলিল, "আমায় তুমি চেন না, তাই ও কথা বল্‌লে—যা বল্লে, আমি ঠিক তার উল্টো! দেবতা নই, খুবই দুর্ব্বল মানুষ"—বলিতে বলিতে বিশ্বেশ্বর ক্ষীণ হাসি হাসিল। ক্ষণেক পরে নতমুখী সাবিত্রীকে বলিল, "আমায় কি কিছু বল্‌বে, সাবিত্রী? যদি বলবার হয়, বল!"

সাবিত্রী একবার তাহার দিকে চাহিয়া আবার তখনি নিম্নদৃষ্টি হইল। মৃদু কণ্ঠে বলিল, "একটা কথা আপনাকে বল্‌তে চাচ্চি। আমায়,—বিয়ের পর কি তারা নিয়ে যাবে?"

"তা নিয়ে যাবে বই কি! এ কথা কেন বল্‌ছ? সবাই ত স্বামীর ঘর করে।"

"এই জন্যে বলছি, তা হলে আমার মার কাছে কে থাকবে? দিদি নেই, আমিও থাকব না, মাকে কালীকে কে দেখবে! আমায় কি বিয়ের পর এখানে রাখাতে পারেন না? অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে?"

বিশ্বেশ্বর একটু হাসিল,—বোধ হয়, সাবিত্রীর লজ্জাহীনতা দেখিয়া একটু, ক্ষোভের জন্যও একটু। হাসিয়া বলিল, "তা কি হয়, সাবিত্রী! এ অনুরোধ কি করা যায়?"

সাবিত্রী একটু ভাবিল। ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে থাক্। আপনি ত এখানে থাকবেন। দাদাও এখন মার কথা শোনে। আপনারাই মাকে দেখবেন—আমার বলা বেশীর ভাগ।"

বিশ্বেশ্বর আবার হাসিয়া বলিল, "বিয়ের কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা হয় না, বুঝি?"

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িল, না! বিশ্বেশ্বর আবার বলিল, "সকলের ত হয়, তোমার হয় না কেন?"

"যাদের হয়, তারা কি আমার মত আত্মীয়-বন্ধুর বুকের রক্ত ভাবনায় ভাবনায় জমাট বাঁধিয়ে দিয়ে সকলের ভার, দুর্ভাবনাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বিশুদা?"

"অমন কথা বলো না, সাবিত্রী, তুমি কি আমাদের ভার?"

"নই কিসে? আমার জন্য কি আপনাদের কম কষ্ট পেতে হচ্ছে। কম খোঁজাখুঁজি, কম চেষ্টা করছেন?"

"এতে ত কষ্ট নেই, সাবিত্রী! তোমাকে কিসে সুখী করব, আমার সেই ভাবনা; তোমাদের সুখেই আমি সুখী হব। এই যে পাত্র আমি স্থির করেছি, তোমার অমত হয়, বল, আমি এখনি এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে এর চেয়েও ভাল পাত্র ঠিক করব। বল, তোমার কি অমত আছে?"

"এমন কথা এক তিলও ভাববেন না। আপনারা সব চেয়ে যাকে মন্দ মনে করেন, এমন কারো সঙ্গেও যদি বিয়ে [illegible] তবু জানবেন, আমি তাতে সুখী হব। তবু জানব, আপনি দেবতা, আপনি আমার মাকে মহা-দায় থেকে রক্ষা করেছেন। দিদি আমাদের আপনার হাতে দিয়ে গেছে।"

সাবিত্রী ভক্তিভরে নত মস্তকে মৃদু চরণে চলিয়া গেল। আত্মহারা স্তম্ভিত বিশ্বেশ্বর ভাবিতেছিল, এ দেবীরা মর্ত্যভূমিতে কেন আসিয়াছে? কেবল কি দুঃখ ভোগ করিতে? সংসারের পাষাণ চরণে কেবলই কি আত্মবলি দিতে? না, এ কথা বলিলে বিধাতার অপমান করা হয়! সতীর আশীর্বাদ সাবিত্রীর মস্তকে আছে, নিশ্চয়—নিশ্চয় সে সুখী হইবে।

বিশ্বেশ্বর আবার কোমর বাঁধিয়া বিবাহ-বাটীতে গিয়া কার্য্য আরম্ভ করিল। অনেক রাত্রে সে বাটী ফিরিয়া শয়ন করিল। পরদিন বৈকালে বর ও বরযাত্রীরা আসিয়া পৌঁছিল। বিশ্বেশ্বর তাহাদের বাসা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল; সমাদরে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান দিল। বরের সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু বরকর্ত্তার আত্মম্ভরী স্বভাবে ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় কিছু অসন্তুষ্ট হইল। যাহা হউক আদর-আপ্যায়নে ভোজনে-ঘুমে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যূষে বিশ্বেশ্বর দুই হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বিবাহ-বাটীতে ছুটিল। সানাইওয়ালা তখন চালার মধ্য হইতে ভোরের তান ধরিয়াছে।

তুলসীতলায় নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন বাটীর আর কেহ উঠে নাই। বিশ্বেশ্বর একটু পরিহাস করিতে গেল, কেন না, সকলের অগ্রে সাবিত্রীই উঠিয়াছে। কিন্তু পরিহাস মুখে আসিল না! সে অচঞ্চলা স্থির-মূর্ত্তি উদাসিনীর পানে নীরবে চাহিয়া থাকিতে হয়; না জানি, সে যোগিনী কোন্ যোগে নিমগ্না! বাহিরের চঞ্চল স্রোত তাহাকে এতটুকু স্পর্শ করিতে পারে নাই! না জানি, সে দেবী কোন্ আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাটী লোকজনে পরিপূর্ণ। চারিদিকে গোলমাল-চেঁচামেচি। গ্রামস্থ সকল লোকই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেছেন। সন্ধ্যার পর

চারিদিকে আলো জ্বলিল, প্রথম রাত্রেই লগ্ন। বিশ্বেশ্বর একা চারিদিকে তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। অন্তঃপুরে অন্নপূর্ণা গৃহিণী। জাহ্নবী আজ সকলের চক্ষে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন। যেখানে সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, সেইখানে গিয়া নীরবে তিনি শুইয়া আছেন। ক্ষণেক পরে সাবিত্রী আসিয়া নিকটে বসিল, তাহার পরণে নববধূর বেশ, মস্তকে কন্যাপত্রিকা। জাহ্নবী শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, "তুমি এখানে কেন, মা—এখন যে পীঁড়ির উপর বসতে হয়, যাও মা, যাও।"

"যাচ্চি মা, একটু তোমার কাছে বসি।"

"না, না, যাও, যাও—দিদি—দিদি কোথায় গেলে?"

সাবিত্রীকে কন্যাপীঁড়িতে না দেখিতে পাইয়া অন্নপূর্ণা ছুটিয়া সেই কক্ষে আসিলেন; জাহ্নবীকে তিরস্কার করিলেন। জাহ্নবী তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া কন্যাকে লইয়া গিয়া যথাস্থানে কন্যা-পীঁড়িতে তাহাকে বসাইয়া দিলেন। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার নিকট হইতে তখন বরের জোড়, হীরকাঙ্গুরীয় প্রভৃতি লইতে আসিয়া বাক্সের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। বাহিরে বাদ্যের তুমুল কোলাহল ও হুলুধ্বনি উঠিল—একজন ভদ্রলোক ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "ওহে বাপু, বর যে দ্বারে উপস্থিত,—এর পরে ও সব নিলে চলবে,—যত সব ছেলেমানুষের কাজ,—চল, চল।"

"যাই" বলিয়া বিশ্বেশ্বর একবার কক্ষের মধ্যে চাহিল। সাবিত্রী তখন চণ্ডী কোলে করিয়া কাঠায়-করিয়া জল লইয়া তোলাপাড়া করিতেছে; বস্ত্রে, সোনার মুকুটে তাহার মুখ আচ্ছন্ন। বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে সভাভিমুখে চলিল। কি এক অজ্ঞাত ভয়ে সত্যই তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল।

বর সভাস্থ হইল। বরপক্ষে-কন্যাপক্ষে তুমুল বাদানুবাদ তর্ক রসিকতা ও গোলমাল চলিতে লাগিল। পাত্র গম্ভীর মুখে দর্পণ লইয়া বসিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর আসিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একবার তাহার পানে চাহিল। বরকর্ত্তা এক পার্শ্বে বসিয়া অতি অল্প পাওনায় যে তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করিতেছিলেন, এবং উৎসুক পরোপকারী গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তারা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া মৃদু স্বরে নানাপ্রকার ভরসা দিতেছিলেন।

নাপিত আসিয়া বলিল "বাবু, আর দেরি কেন? ভিতরে সব ঠিক হয়েছে।" বিশ্বেশ্বর হরিকে ডাকাইয়া যাহা বলিতে হইবে, শিখাইয়া দিলেন। হরি গলবস্ত্রে যোড় হস্তে বলিল, "তবে সকলে অনুমতি করুন, কন্যা পাত্রস্থ করা যাক।"

"হাঁ, হাঁ! অবশ্য অবশ্য"র সঙ্গে সঙ্গে জয়-ঢক্কার ন্যায় বরকর্ত্তার নিনাদ উঠিল, "আগে পণের টাকা আনুন—তবে সে কাজ।"

"সেটা ত, তার আর কথা আছে! এই নিন তোড়া। এখন পাত্র ওঠাতে পারি?"

বরকর্ত্তা টাকা গণিতে গণিতে বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া নিবারণ করিলেন। বিরক্ত হৃদয়ে হরি ও বিশ্বেশ্বর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। টাকা গণিয়া মহিষাসুর-কান্তি বরকর্ত্তা বলিলেন, "হাঁ, এ ত তিন হাজার পাওয়া গেল, এখন বরাভরণ, কন্যাভরণ, এ সব দেখা দরকার! শেষে যে গোলে হরিবোল হবে, তাতে আমি নেই। সভায় কন্যা আনয়ন করুন। এখনকার বিবাহে এই রকমই নিয়ম।"

বিশ্বেশ্বর ঈষৎ উত্তপ্ত হইয়া বলিল, "আমাদের এত ছোট্‌লোক

ভাববেন না। কন্যা সভায় টভায় আনা হবে না। ভিতরে চলুন, সেইখানে গিয়ে দেখে নেবেন।"

"এ ত রাগারাগির কথা নয়, ধাপু! লেহ্য দেনাপাওনার কথা! সভায় কন্যা আনায় দোষ কি? আমাদের দেশে এই রকম নিয়ম।" অনেকে বরকর্ত্তার বাক্যের অনুমোদন করিল।

বিশ্বেশ্বর স্থির কণ্ঠে বলিল, "আপনাদের নিয়ম এখানে চলবে না—কন্যা সভায় আনা হবে না।" অগত্যা মন্ত্রণাপক্ষীয় দুই জন লোক বরকর্ত্তাকে চুপি চুপি বলিল, "একে নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না—ভিতরেই চলুন। সেখানে সব হবে।"

বর, বরকর্ত্তা ও কন্যাপক্ষীয়-বরপক্ষীয় কয়েক জন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বরাভরণাদি দেখিয়া বরকর্ত্তা রাসভ-নিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, "কন্যা আন, কন্যা নিয়ে এসো।"

স্ত্রীমহলে রব উঠিল, "ওমা, আগে স্ত্রী-আচার হবে, তবে ত বিয়ে।"

হরি রোয়াকে উঠিয়া তাহাদের তাড়া দিয়া বলিল, "রাখ তোমাদের স্ত্রী-আচার! আগে বরকর্ত্তার পছন্দই হোক; এ ত বিয়ে দিতে নিয়ে যাচ্চি না, মাল যাচাই করাতে চলেছি।"

অবগুণ্ঠনবতী সাবিত্রীকে হাঁটাইয়া লইয়া আসিয়া হরি বরকর্ত্তার নিকট বসাইয়া দিল। বরকর্ত্তা একে একে অলঙ্কারাদি দেখিয়া ঈষৎ প্রসন্ন-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। "হাঁ, তা কন্যাকে আর ঘরে নিয়ে যেয়ো না; তোমরা স্ত্রী-আচার আরম্ভ কর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কন্যাকর্ত্তা কই?" হরি বিশ্বেশ্বরের পানে চাহিতেই বিশ্বেশ্বর হরিকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ইনিই কন্যাকর্ত্তা। কন্যার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।"

"তা গিয়ে, তা বেশ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা কথা! এ কথা তোমাদের আগেই স্বীকার করা উচিত ছিল, তা হলে কি আমি এ কাজ করতে আসি? যাহোক আর এক হাজার টাকা পেলেই আমি রাজি হতে পারি, তার কারণ, তোমরা ভদ্রলোক, তোমাদের জাত মারতে চাইনে!"

বিশ্বেশ্বর বাধা দিয়া বলিল, "আবার কিসের টাকা, মশায়? আপনি যে নানান্ ফেঁকড়া তুল্‌ছেন? বিবাহ কি দেবেন না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কে হে বাপু? মাঝ থেকে কথা কও? কথা হচ্চে কন্যাকর্ত্তার সঙ্গে—"

বিপন্ন হরি বাধা দিয়া বলিল, "উনিই কন্যাকর্ত্তা, মশায়! যা বল্‌তে হয়, ওঁকেই বলুন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের দেখ্‌ছি, অনেক বিদ্যে জানা আছে! কে কন্যাকর্ত্তা, তারই ঠিক নেই! যেমন পবিত্র কুল, তেমনি জোচ্চুরি! এমন জায়গাতেও মানুষ ছেলের বে দিতে আসে?"

বিশ্বেশ্বর অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, "বলুন, কি বল্‌তে চান, আমিই কন্যাকর্ত্তা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা এতক্ষণ তবে জোচ্চুরি হচ্ছিল কেন? আর হাজার টাকা না হলে আমি বে দেব না।"

"কেন? কিসের জন্যে? আপনার সব টাকা ত আপনি গুণে পেয়েছেন।"

"তোমাদের কুল এমন পবিত্র, তা কি জানি? কন্যার বড় বোনের চরিত্র ভাল ছিল না,—বিষ খেয়ে মরেছে শুন্‌ছি।"

বিশ্বেশ্বর গর্জ্জিয়া উঠিল, "সাবধান! কার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মুখ সাম্‌লে কথা কবেন্।"

"কিসের মুখ সাম্‌লাব? দিলুম না ত বে! দেখি, তোমরা কি করতে পার! চল বরেন্দ্র, ওঠ।" বর বরাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া গিয়া বরকে ধরিল। কেহ গিয়া বরকর্ত্তাকে ধরিল, "মশায় করেন কি—করেন কি? থামুন, আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি—এমন কাজ করবেন না।"

"মেয়ে দিতে এসে এত জোর-জরুরি, কিসের? দেখি, কি করে মেয়ে পার হয়?"

"থামুন, থামুন, আমরা মিটিয়ে দিচ্ছি।" পরশুভাকাঙ্ক্ষী মণ্ডলেরা দুই একজন আসিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় রুদ্ধহস্তপদ বিশ্বেশ্বরের পৃষ্ঠে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "ওহে, এত করলে ত আর এ সামান্যর জন্য আর কেন! একটা হাজার টাকা বই ত নয়, দিয়ে ফেল, আমরা এর পর না হয় চাঁদা তুলে ও টাকাটা তোমায় দিয়ে দেব। যাও, টাকা এনে মিটিয়ে ফেল, লগ্ন পণ্ড হয়।"

নারীমণ্ডলী চিত্রপুত্তলির ন্যায় রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের হাতের শঙ্খ হাতে, মুখের হুলুধ্বনি মুখে নিরুদ্ধ। বিশ্বেশ্বর চাহিয়া দেখিল, কে একজন পার্শ্বে মূর্চ্ছিতের মত বসিয়া, পড়িয়াছে; অন্নপূর্ণা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে করিতে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক পাড়িয়া বলিলেন, এসে টাকা নিয়ে যাও—লগ্ন ভস্ম হয়, দেরী করো না।

বিশ্বেশ্বর বুঝিল, মূর্চ্ছিতা স্ত্রীলোক, জাহ্নবী। নিকটে দাঁড়াইয়া হরি ভয়ার্ত্তভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। নিমেষে একবার সাবিত্রীকে সে দেখিয়া লইল,—সে তেমনি অবগুণ্ঠনমুখী, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিশ্বেশ্বর স্থির কণ্ঠে বলিল, "শুনুন,

আমার শেষ কথা! কন্যার ভগিনী দেবীতুল্যা, সকলে স্বর্গে গিয়েছেন। আমি আর কোনমতেই টাকা দেব না এতে আপনার যা ইচ্ছা হয়, করুন।"

সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, "কর কি বিশ্বেশ্বর! কর কি!" হরি আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "বিশু বাবু, কি বলছেন?" স্থির কণ্ঠে বিশ্বেশ্বর বলিল, "হরি, তুমি থাম। আপনারা মনেও কর্ব্বেন না যে, আর আমি টাকা দেব। তবে বরকে এই কথা বল্‌ছি! যে রত্ন ওঁকে আজ দিতে এসেছি, তার মূল্য যদি তিনি বুঝতে পারেন ত বুঝবেন, যে তিনি ভাগ্যবান ব্যক্তি! দেখুন দেখি, এ দ্রব্য কি মূল্য দিয়ে বিক্রী হয়?"

বিশ্বেশ্বর সাবিত্রীর নিকটে আসিয়া তাহার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া শোলার ময়ূর টানিয়া ফেলিয়া দিল। সাবিত্রীকে বরের পানে ফিরাইয়া সে বলিল, "দেখুন, এ রত্নের কি মূল্য হয়?"

বর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "পিতা বর্ত্তমানে আমাকে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

বরকর্ত্তা ডাকিলেন, "এস হে বাপু, উঠে এস—এদের ত বে দেওয়া নয়—ধাষ্টমো—চল, আমরা যাই।" যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলিল, "বিশু, কর্‌ছ কি? এখনও বোঝ!"

"আমি বেশ বুঝেছি।"

বরপক্ষেরা বলিল, "আচ্ছা, হাজার না দাও ত, পাঁচশো!"

"আর এক পয়সা নয়।"

বিচক্ষণেরা গিয়া বরকর্ত্তাকে চোখ টিপিল, বলিল, "আর কাজ নেই, এ দাঁও ফসকাল, এখন যথালাভ করে আগের সর্ত্তমতই

"কি হান্।" তখন তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আচ্ছা, এস, কি আমরা মিটিয়ে দিচ্চি ; মশায়, ভদ্র লোকের জাতমারা ধর্ম্ম সয় না। আপনি না হয় একটু ক্ষতি স্বীকার করে আগের সর্ত্তমতই রাজি হন্। যাও হে হরি, কন্যাকে পীঁড়িতে বসিয়ে দাও। বর বাবাজীও পীঁড়িতে গিয়ে বসুন। চল হে বিশ্বেশ্বর—আর কেন!"

বিশ্বেশ্বর নড়িল না। কাঠের মত অটল ভাবে দাঁড়াইয়া অটল কণ্ঠে সে বলিল, "আপনারা আর আমায় অনুরোধ করবেন না। পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যান্, এমন ঘটনার পরেও যে এ রকম চণ্ডালদের হাতে একটী বালিকাকে বিসর্জ্জন দিতে পারে, সে নিজেও চণ্ডালের অধম। আপনারা যান্, আমরা বিয়ে দেব না।"

সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। বিশ্বেশ্বরের যে কথা, সেই কাজ, তাহা সকলেই জানে। নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া বরপক্ষীয়েরা আস্ফালন করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। হিতাকাঙ্ক্ষী রামতনু সান্ন্যাল বলিলেন, "বিশ্বেশ্বর, কি করলে! এখনো বল, ফিরিয়ে আনি—নইলে যে ব্রাহ্মণ-কন্যার জাত যায়।"

"কেন জাত যাবে? অন্য পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিন।"

"আর পাত্র কই? এত রাত্রে কোথায় পাত্র পাবে?"

"বেশী দূরে খুঁজ্‌তে যেতে হবে না, নিকটেই আছে! সান্ন্যাল মশায়! আপনার ওপর নিমন্ত্রিতদের ভার দিলাম, সব দেখুন শুনুন। নিবারণ, হরিশ, তোমরাও যাও। আমিই এ বিবাহের পাত্র।"

সহসা সেখানে বজ্রপাত হইলেও কেহ এতদূর আশ্চর্য্য

হইত না। মণ্ডলদের আমোদ করা ঘুরিয়া গেল। সকলে সেখানে সমবেত হইয়া ব্যাপার কি, ব্যাপার কি বলিয়া গোল বাধাইল।

বিশ্বেশ্বর বলিল, "ব্যাপার আর কিছুই নয়। আমার পিতা নেই, কাজেই আমাকেই আপনাদের অভ্যর্থনা করতে হচ্চে, আপনারা শুভকার্য্যে যোগ দিন।" সকলে ক্ষণেক নীরব রহিল। দুই-একজন মাতব্বর অগ্রসর হইয়া বিশ্বেশ্বরকে অনেক সাধুবাদ দান করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বর সংক্ষেপে তাঁহাদের প্রণাম করিয়া মাসিমার নিকটে আসিয়া ডাকিল, "মাসিমা!"

অন্নপূর্ণা ভিড় হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বরের মস্তকটা শিশুর মস্তকের মতই বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিলেন। দুই হস্তে নীরবে তাহার মস্তকোপরি স্নেহাশীষ বর্ষণ করিলেন। বিশ্বেশ্বর একবার জাহ্নবীর পদতলে মস্তক অবনত করিয়া ছান্‌লাতলায় আসিয়া দাঁড়াইল, সান্যালকে বলিল, "তবে আমি বস্‌তে পারি? সব ভার আপনার।"

"সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। আমরা সব ভার নিচ্চি—তুমি যা [illegible], কর।"

বিশ্বেশ্বর বরের যোড় তুলিয়া নীরবে পরিয়া লইল। বরাসনে গিয়া সে উপবিষ্ট হইলে, পুরোহিত বলিলেন, "উঁহু, উঁহু, আগে স্ত্রী-আচার, সাত পাক, শুভ দৃষ্টি,—পরে দান।"

বিশ্বেশ্বর এইবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। তখন নিরুদ্যম যুবকবৃন্দ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বরকে পিঁড়ের উপর লইয়া গিয়া দাঁড় করাইল। তুমুল রবে হুলু ও শঙ্খ ধ্বনি করিয়া নারীগণ আসিয়া বরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বরের নাসিকা ও কর্ণের উর্দ্ধস্থ

কেহই কোনরূপ মায়া দেখাইল না ; যুবকেরা কেহ কেহ হাসিয়া বিশ্বেশ্বরকে বলিল, "শুধু ত বর হওয়া নয়, এখন বোঝ।"

কন্যাকে পীঁড়িতে করিয়া আনিয়া সাত পাক দেওয়া হইল। জাহ্নবীকে টানিয়া তুলিয়া অন্নপূর্ণা বলিতে লাগিলেন, "হতভাগী, ত্থাখ্ একবার—একবার চেয়ে ত্থাখ্।"

সাত পাক, শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। বর কন্যাকে সম্প্রদানের স্থানে বসান হইল, হরি দক্ষিণে বসিয়া কন্যা সম্প্রদান করিল। বিশ্বেশ্বর দক্ষিণ হস্তে কন্যার হস্ত গ্রহণ করিয়া নীরবে হরির প্রতি ইঙ্গিত করিল। সে অনেকক্ষণ হইতে সাবিত্রীর নিস্পন্দ অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিল। তখন হরি একবার সাবিত্রীর মুখস্পর্শ করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "তাইত—এখন উপায়!"

পুরোহিত বলিল, "কি উপায়? কি হয়েছে?"

"আজ্ঞে, কন্যা অসুস্থা হয়ে পড়েছে।"

"তা ত' হওয়াই সম্ভব! যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড। এই হল আর কি, শীগগির শীগগির মন্ত্র কটা বল ত বাবা।"

বিবাহ শেষ হইয়া গেল। হরি ভীত কণ্ঠে ডাকিল, "পিসিমা, এদিকে কেউ আসুন"। জাহ্নবী আসিয়া সাবিত্রীর লুণ্ঠিত মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। অন্নপূর্ণা নীরবে ব্যজন করিতে ও জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে সাবিত্রী যেন একটু সুস্থ হইল। জাহ্নবী ডাকিলেন, "সাবি, কেন মা, অমন করছ? আজ যেন আমি সাগর-ছেঁচা মাণিক পেয়েছি, মা।" সাবিত্রী দুই হস্তে মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা, দিদি কই, মা! দিদিকে ডাক।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কাল ধীরে ধীরে আপনার সাম্বৎসরিক আবর্ত্তনের অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রতি বৎসরের মত এবারও বিশ্বেশ্বরের বহির্বাটীর পার্শ্ব-স্থিত উদ্যানের আম্রবৃক্ষগুলা গুচ্ছ গুচ্ছ মুকুল ও তাম্রবর্ণ কিশলয়ে ভরিয়া উঠিয়াছে; মৌমাছিগুলার তিলার্দ্ধ অবসর নাই। সরল উন্নতশীর্ষ নারিকেল তরু শীতের কবল হইতে নিস্তার পাইয়া ত্বরিৎ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া নবীন বায়ুভরে মস্তক দুলাইতেছে। বাতাবি লেবুর গাছদুইটী নববধূর মত যেন রক্তাম্বর পরিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অর্দ্ধস্ফুট ফুলগুলা লইয়া বাতাসের বড়ই আমোদ! সে তাহাদিগকে দুলাইতেছে, ঝরাইতেছে, গন্ধ হরণ করিয়া এদিকে ওদিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। ক্ষুদ্র বালিকার মত বেলা যুঁই-মল্লিকার দল আপনার শোভা-সুগন্ধি লইয়া বড়ই বিব্রত; যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বায়ুর দৃষ্টিপথ এড়াইবার তাহারা চেষ্টা করিতেছে। সবই প্রতি বৎসরের মত, কিন্তু বিশ্বেশ্বর প্রভাতে পুস্তক-হস্তে নারিকেল বৃক্ষের নিম্নে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতেছিল, এবার ঋতুর সাজ যেন সম্পূর্ণ নূতন!

কতকগুলা খাতাপত্র হস্তে কর্ম্মচারী নিবারণ আসিয়া বলিল, "এই হিসেবগুলো আপনাকে দেখে নিতে হবে! মন্দিরের জন্য যে টাকা এষ্টিমেট্ করা হয়েছিল, তার চেয়ে কিছু বেশীই খরচ পড়্‌বে, বোধ হচ্ছে।"

বিশ্বেশ্বর হস্তের পুস্তকখানা মুড়িয়া ধরিয়া বলিল, "এষ্টিমেটের চেয়ে কিছু বেশী হয়েই থাকে। চলুন, ঘরে গিয়ে বসে দেখা যাক্।"

এমন মনোহর শৃঙ্খলাহীন প্রকৃতির মধ্যে এ সব সাংসারিক ব্যাপারের আলোচনা করা তাহার মনঃপূত হইল না। হস্তস্থিত কাব্যখানা বেঞ্চের উপর ফেলিয়া রাখিয়া উভয়ে বৈষয়িক হিসাব-নিকাশের কক্ষে গিয়া বসিল। খাতা-পত্র দেখিতে দেখিতে বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "মন্দিরটা তৈরি হতে আর কতদিন লাগ্‌বে, মনে করেন?"

"বাড়ীটা ত শেষ হয়েছে,—এখন মন্দির, আর যা-যা বাকী, সব হচ্চে। হ্যাঁ, হরিশ বল্লে যে, যে হিসেবের কাগজ তৈরি করতে বলেছিলেন, সেগুলোর কতক হয়েছে—একবার দেখবেন?"

"আচ্ছা। আসছে বছর সংক্রান্তির দিনে মাসিমা মন্দির আর ঠাকুর প্রতিষ্ঠার দিন স্থির করেছেন।"

"তার আগে সব শেষ হয়ে যাবে।"

যথা-কর্ত্তব্য-সমাপনান্তে বিশ্বেশ্বর স্নানার্থে উঠিল। বাটীর মধ্যে গিয়া সে ডাকিল, "মাসিমা, তেল।"

মাসিমা তখন রন্ধনে ব্যস্ত, নিকটে বধূ বসিয়া হলুদ বাটিতেছিল, আদেশ করিলেন, "বিশুকে তেল দিয়ে এস ত' মা।"

বধূ একবার ইতস্তত করিয়া অগত্যা অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া তৈল লইয়া বাহির হইল। নিধুর মা উঠানে বসিয়া মাছ কুটিতেছিল, বিশ্বেশ্বর তাহার চক্ষু এড়াইবার জন্য সরিয়া গিয়া বারান্দার থামের পাশে দাঁড়াইল। বধূ অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া দেখিল, যিনি তৈল চাহিয়া গেলেন, তিনি সেখানে উপস্থিত নাই। সেইখানে বাটি রাখিয়া সে রন্ধন-গৃহে ফিরিতেই মাসিমা বলিলেন, "বিশু ওখানে আছে?"

বধূ নত মুখে বলিল, "না।"

"কোথায় গেল, গিয়ে দেখে এস। যে ছেলে, হয়ত এখনি রুক্ষুই নাইতে চলে যাবে। একটু তর সয় না! এত দিনেও ওর স্বভাব বুঝ্‌তে পারনি, মা?"

বধূ কিন্তু মাসিমাতা অপেক্ষা স্বভাবটা আর একটু পরিষ্কার বুঝিয়া লইয়াছিল, তাই কুণ্ঠিত হইয়া, অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া অগত্যা তৈলের বাটী লইয়া সে প্রাঙ্গণে নামিল। মৃদু স্বরে নিধুর মাকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল। নিধুর মা তখন নিজ কার্য্যে ব্যস্ত, বলিল, "কি জানি, ঘরে গিয়েছেন হয় ত।"

প্রাঙ্গণ পার হইয়া সে শয়ন-কক্ষের বারাণ্ডায় উঠিয়া কয়েক পদ যাইতেই থামের পার্শ্ব হইতে তাহার অঞ্চল ধরিয়া কে একটু টান দিল। বিব্রত মুখে সাবিত্রী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, অন্য কাহাকেও দেখা যাইতেছে কি না! কেহ নাই! তখন সে স্বামীর পায়ের নিকট বাটী রাখিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "তেল।"

"তা দেখেছি, কিন্তু একটা মজার কথা আছে, শোন।"

অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে বধূ মিনতিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল, "এখন কাজ আছে, আমি যাই।"

"যাও না, কেন, কে তোমায় ডাক্‌তে গেছ্‌ল! অত কম ঘোমটা মানুষ দেয়! আর একটু টানো!" বলিয়া বিশ্বেশ্বর বধূর ঘোমটা সুদীর্ঘতর করিয়া টানিয়া দিল। বধূ বিপদ দেখিয়া দ্রুতপদে পলাইল।

"শোন, শোন,—আচ্ছা বেশ! এর শোধ দেব।"

নদীতে স্নান করিয়া আসিয়া বিশ্বেশ্বর খাইতে বসিল। মাসিমা পরিবেষণ করিতে করিতে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "হরির জন্যে যে মেয়েটি দেখ্‌তে গেলি, সেটি কেমন! তোর শাশুড়ী কাল তোদের নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে।

বৌমাকে এখন দুদিন তার মার কাছে পাঠাব, বাছা এখানে একটিও সমবয়সী পায় না, মুখটি বুজে থাকে, তা আমারও তাকে বেশী দিন ওখানে রাখ্‌লে চল্‌বে না, দিন চারেক রাখ্‌ব। তোর দোকানে এখন না কি খুব লাভ হচ্চে, হরিশ বল্‌ছিল!" সকল প্রশ্নেই বিশ্বেশ্বর "হাঁ" "বেশ" ইত্যাদি উত্তর দিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে একবার চকিত নেত্রে রন্ধন-গৃহে, দ্বারের ফাঁকে, জানালার পানে চাহিতেছিল, আশা অবশ্য, তাহার এই রাগ-রাগ ভাব কাহারও চোখে পড়িবে।

আহারান্তে শয়ন-কক্ষে আসিয়া সে দেখিল, সাবিত্রী বিছানার পার্শ্বে টুলের উপর জলের গ্লাশ, পানের ডিবা ও গামছা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের ভয়ানক রাগ হইল,—রাগ করিয়া সে পান না খাইয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল। ক্ষণেক পরে তাহার মনে পড়িল, একদিন এইরূপ রাগ করিয়া পান না খাওয়াতে সাবিত্রী কিরূপ বিষণ্ণ নেত্রে তাহার পানে চাহিয়াছিল। ডিবা খুলিয়া পান মুখে দিয়া বিশ্বেশ্বর স্বগত সাবিত্রীকে শাসাইল, ভবিষ্যতে এরূপ দোষ করিলে কিন্তু আর সে ক্ষমা করিবে না।

ঘণ্টাদুয়েক নিদ্রা দিয়া উঠিয়া বিশ্বেশ্বর বিক্রয়কার্য্যাদি তত্ত্বাবধানের জন্য জুতা-জামা পরিয়া লইয়া বাহির হইল। তখন আর খেলা-ধূলার সময় নয়, অনেকক্ষণ মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন। তথাপি মাসিমার শয়ন-কক্ষের নিকট দিয়া নিঃশব্দ পদে যাইতে যাইতে সে কান পাতিয়া শুনিয়া গেল, সেখানে মাসিমার মহাভারত-শ্রবণ-কার্য্য চলিতেছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বর বাটী ফিরিল। সন্ধানে জানিল, অন্নপূর্ণা জাহ্নবীর নিকট গিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল, এমন সময়টা

কলহে কাটান অতি নির্ব্বোধের কার্য্য। নিঃশব্দ পদে এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া ঠাকুর-ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া উঁকি মারিয়া সে দেখিল, সাবিত্রী পট্টবস্ত্র পরিয়া একখানা তামার পাত্রে ফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। বিশ্বেশ্বর একবার প্রেমের যুগল-মূর্ত্তি বিগ্রহের পানে চাহিয়া দেখিল, আবার তখনি নত-বদনা সাবিত্রীর পানে চাহিল,—দেবীর মুখে নিপুণ শিল্পী প্রেমের যে একটী বিচিত্র ভাব ফুটাইয়া তুলাইয়াছে, সিংহাসন-নিম্নে মানবীর মুখেও সেই মধুর ছায়া। ধীর পদে নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "কার জন্যে মালা গাঁথা হচ্চে?"

চমকিয়া সাবিত্রী একবার চাহিয়া দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া লইল। মৃদু স্বরে বলিল, "ঠাকুরের জন্য।"

"কোন্ ঠাকুরের জন্য?"

সাবিত্রী একবার মুখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাহিল। বিশ্বেশ্বর পরম গম্ভীর মুখে বলিল, "তোমার ঠাকুর কদিন অন্তর বদ্‌লি হয়ে থাকে? তোমার দেবত্ব পদ দিতে নিতে, দেখ্‌ছি বেশীক্ষণ সময় লাগে না।" সাবিত্রী এইবার মৃদু হাসিয়া মুখ নীচু করিল। বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা হইল, মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া সেই প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু একবার দেখিয়া লয়। একেবারে তাহার নিকট গিয়া বসিয়া তাহার হস্ত হইতে অর্দ্ধ-গ্রথিত মালাটা কাড়িয়া লইয়া সে বলিল, "আমি তা বলে সহজে পদ ছাড়ছি না, এ মালা আমার।"

অর্দ্ধ-শঙ্কিত মুখে সাবিত্রী বলিল, "ও কি কর্‌লে? ওতে যে অপরাধ হয়। ঠাকুরের জন্য মাসিমা—"

"কেন, বল্লে না, কোন্ ঠাকুরের জন্য? তখনকার পণ্ডিতি কথাগুলো বুঝি আর মনে নেই?"

সাবিত্রী গতিক বুঝিয়া ফুলের ডালাটা তাড়াতাড়ি সরাইয়া রাখিল। ঠাকুরের সম্মুখে স্বামীর এই কার্য্যে মনে সে একটু ভয়ও পাইয়াছিল, তাই গলায় অঞ্চল দিয়া তাড়াতাড়ি বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম করিল। বিশ্বেশ্বর ততক্ষণ মালা গাছটা আপনার কণ্ঠে বেশ করিয়া জড়াইয়া লইয়াছে। প্রণতা সাবিত্রী মুখ তুলিতেই সে বলিল, "এদিকে আর একজন দেবতা হাঁ করে দাঁড়িয়ে, এমনি ভক্তি যে, তাকে একটা প্রণামও নেই! হায়রে অদৃষ্ট!"

সাবিত্রী চঞ্চল নেত্রে স্বামীর মুখপানে চাহিল, বুঝি অনেক কথা তাহার মনে আসিতেছিল, বুঝি মনে হইতেছিল, সত্যই বিশ্বের ঈশ্বর তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। সহসা উচ্ছ্বাস-ভরে সাবিত্রী নতজানু হইতে না হইতে একটা সুদৃঢ় বাহুপাশ তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল ব্যগ্র কণ্ঠে বিশ্বেশ্বর বলিল "ও কি ওকি?" লজ্জিতা সাবিত্রী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু স্বরে বলিল "কেন, নমস্কার করলে কি দোষ হয়?"

"তা বই কি! গুরু শিষ্যের মত কেবলই নমস্কার আর আশীর্ব্বাদ, কেমন? লজ্জা হয় না।"

"লজ্জা কেন হবে! ঠাকুরকে নমস্কার করতে কি লজ্জা হয়?"

বিশ্বেশ্বর অপলক দৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের প্রতি চাহিল, তিরস্কার, অভিমান, বেদনা সে দৃষ্টিতে যেন মাখানো ছিল। সাবিত্রী সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া মুখ নত করিল। বিশ্বেশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "সাবিত্রী! এখনও কি তোমার মুখে সেই কথা? তোমার মনের কথা আমি এখনও বুঝতে পারি না। এখনও কি তুমি আমায় এত দূর, এত পর ভাব?"

স্বামীর কণ্ঠস্বরে সাবিত্রীও মনে ব্যথা পাইল, ম্লান মুখে বলিল, "এতে কি পর ভাবা হয় ?"

"নয় কিসে ? ঠাকুর-দেবতা কাকে বলে ?"

"যে অনাথাদের আশ্রয় দেয়, দুঃখীর দুঃখ দূর করে, পথের কাঙালকে সিংহাসনে বসায়— ।"

সাবিত্রীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বিশ্বেশ্বর ধীর স্বরে বলিল, "আর যে ভালবাসে, যে শুধু ভালবাসাই চায়, তাকে বলে, মানুষ। অন্যে যে যা বলে বলুক, তুমি এ কথা বলো না। এত কাছে রয়েছ, তবু তুমি আজও কি আমার কিছু জান ? এত কাছে থেকেও কি আমরা দুজনে এত দূরে থাকব, সাবিত্রী ?"

সাবিত্রী এইবার স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল। একবার সে বলিতে গেল, তুমি আমায় যাহা দিয়াছ, তাহা কি আমি কখনও আশা করিতে পারিয়াছিলাম ! আমি কি এখন নিজেকে তোমার যোগ্য ভাবিতে পারি ? ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায় আমরা ভাসিয়া যাইতাম, তুমি আশ্রয় দিয়াছ, আশার অধিক পাশেও স্থান দিয়াছ,—ইহার বেশী আর অধিক কথা তুলিয়ো না, আমার তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই।

সহসা বাহির হইতে বালকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, "ছোট্‌দি।" "কালী এসেচে" বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল। বিশ্বেশ্বর অন্য দ্বার দিয়া নিজ কর্ম্মে পলাইল, কেননা, প্রাঙ্গণে মাসিমা। কিছুক্ষণ পরে সাবিত্রী আসিয়া ঘরে দীপ জ্বালিল। বিশ্বেশ্বর পানের ডিবা হস্তে লইয়া দেখাইয়া বলিল "ঝগড়াটা এখন ধামা-চাপা রইল। আমি ভুলে গেছি, মনে করো না।" সাবিত্রী দ্রুত পলাইল।

বিশ্বেশ্বর পুস্তকের পাতা উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল। কিছু পড়িতেছে না, অথচ দেখিয়া দেখিয়া যাইতেছে। চক্ষে শুধু একটা আনন্দের রশ্মি, প্রাণে শুধু কতকগুলা কল্পনার ক্রীড়া, শরীরে কেবল একটা পুলকের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল। সহসা হস্তে একখানা পত্র উঠিয়া আসিল! এ সেই পত্র, সতীর সেই অন্তিম অভিব্যক্তি! বিশ্বেশ্বর একবার মনে মনে পত্রখানা পড়িয়া লইল। অনেক দিনের কথা তাহার মনে পড়িল, তখন সতীর এই কথাগুলা মর্ম্মাহত হৃদয়ের অভিশাপ-বাণী বলিয়া মনে হইত, এখন মনে হইল, না, তাহা নয়। ঈষৎ বেদনাক্লিষ্ট অথচ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের এ অজস্র আশীর্ব্বাদ। এই যে সতী লিখিয়াছে, "এই অধমা জাতিকেই স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবে, ভালবাসিবে। অধমা জাতি বক্ষের মধ্যে কত সম্পদ লুকাইয়া রাখে, তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিবে। স্বীকার করিবে, এই স্নেহের আদান-প্রদানেই শ্রেষ্ঠ সুখ।" এ কি অভিশাপ? এ যেন ভবিষ্যৎ-বক্তার দৈববাণী! সত্যই ত সে মূঢ়, তাই সে ইহার মর্ম্ম বোঝে নাই। আবার সে পড়িল, "তুমি সুখী হও, অন্যকে সুখী কর।" বিশ্বেশ্বর পত্রখানা লইয়া মাথায় ঠেকাইল!

তাহার পর সে ভাবিয়া দেখিল, পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত। কি জানি, যদি কখনও সাবিত্রী দেখিতে পায়! এ পত্র পড়িলে যে সে মনে দ্বিগুণ ব্যথা পাইবে, তাহাতে ভুল নাই। সে তাহার দিদির জন্য একেই কাতর, তাহাতে এ পত্র ঘৃতাহুতির কার্য্য করিবে। সাবিত্রীকে লুকাইতে হইবে, এ চিন্তায় বিশ্বেশ্বর ক্লিষ্ট হইল, কিন্তু নহিলে নয়! অগত্যা বিশ্বেশ্বর পত্রখানা প্রদীপের শিখায় ধরিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অন্নপূর্ণা দেবীর ইচ্ছা ছিল, বৎসরান্তে চৈত্রমাসে তিনি তাঁহার অভীপ্সিত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু সাংসারিক নানা ঘটনায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না। বিশ্বেশ্বরের বিবাহের দুই বৎসর পরে শ্রাবণ মাসে, ঘটনা-ক্রমে যেদিন তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সেই দিনেই অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন পড়িল।

ইতিমধ্যে সাবিত্রী আর একটা আঘাত পাইল। জাহ্নবী দেবী পৃথিবীতে যেন কোন অবস্থাতেই শান্তি পাইতে ছিলেন না, সহসা একদিন তিনি মরিয়া চির-শান্তি লাভ করিলেন। সাবিত্রী প্রথমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল, শেষে মনে ভাবিয়া লইল, তাহার দিদির কাছে গিয়া মা ভালই আছেন। তাহাদিগকে সুখী দেখিয়া রাখিয়া মাতা তাহার অভাগিনী কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই সাবিত্রী চোখের জল মুছিল। হরি এখন বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে, বালক কালী দিদিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কাজেই এখন ভট্টাচার্য্য-বাড়ী নূতন লোক লইয়া নূতন সুখ-দুঃখে আবর্ত্তিত।

মন্দির ও বিগ্রহ "অন্নপূর্ণা"-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। উৎসবে গ্রাম তুমুল আন্দোলিত হইল। সকলে ভাবিয়াছিল, অন্নপূর্ণা দেবীর নিজ সম্পত্তিতে নিশ্চয় প্রকাণ্ড এক অতিথিশালা-সদাব্রত প্রভৃতি বসিবে। বিশ্বেশ্বরও প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিল, কিন্তু অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বিশু, ভগবানের রাজ্যে আহার এক রকমে তিনি মানুষের জুটিয়ে দেন, কিন্তু যারা মানুষের আর সমাজের

অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়, তাদের কষ্টই সব চেয়ে বেশী। এই সম্পত্তিতে এই ব্যবস্থা কর, যাতে নিঃস্ব লোকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পায়। অন্য কোন পুণ্য-লাভে আমার কামনা নেই, কেবল আমাদের দেশের দুখের মেয়েরা যেন বাপ-মার অর্থের অভাবে জন্মের মত না জ্বলন্ত আগুনে পড়ে, এই শুধু আমার কামনা। এই সামান্য অর্থে যদি একটি মেয়েরও চোখের জল ঘোচে, তা হলেই আমার এ অর্থ সার্থক হবে।"

বিশ্বেশ্বর নীরবে মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিল। "অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার" এই উদ্দেশ্যেই উৎসর্গিত হইল। এইরূপ নামকরণে মাসিমাতা বহু আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বেশ্বর সে আপত্তি গ্রাহ্য করে নাই।

"অন্নপূর্ণার মন্দিরে" সেদিন বিষম ব্যাপার। বস্ত্রাদি দান, বিদেশ হইতে আগত পণ্ডিতদিগকে যথাযোগ্য সম্মানে বিদায় প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে গ্রামবাসীরাও অন্য সকলে নিজ নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিল। সকলেই এখন বিশ্বেশ্বরের অত্যন্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, নিতান্ত বিশ্বস্ত।

সাবিত্রীও সেদিন কোমরে কাপড় জড়াইয়া লক্ষ্মীমূর্ত্তিতে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণে অন্ন-পরিবেষণে নিযুক্তা। অন্নপূর্ণা অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহা শোনে নাই।

বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল,—অন্নপূর্ণা তখন তাঁহার হস্ত ধরিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন স্তূপের মধ্য হইতে তাহাকে টানিয়া আনিলেন। বলিলেন, "পাগ্‌লীর মেয়ে! আজ্‌কে মারা গেলি যে, দেখ্‌চি। একটু বস্‌, ঠাণ্ডা হ, একটু জল মুখে দে।" চারিদিকে লোকের গতায়াতে,